সঞ্চয়িতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্চয়িতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্চয়িতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ পৌষ ১৩৩৮

দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৪০

তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৪৪

পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৪৬

চতুর্থ সংস্করণ চৈত্র ১৩৫০

পঞ্চম সংস্করণ কার্তিক ১৩৫১

ষষ্ঠ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৫৪, আশ্বিন ১৩৫৬

পৌষ ১৩৫৯, আশ্বিন ১৩৬২. বৈশাখ ১৩৬৫, পৌষ ১৩৬৬

চৈত্র ১৩৬৭, আশ্বিন ১৩৭০, আশ্বিন ১৩৭৩

সপ্তম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৬ : ১৮৯১ শক

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীত্রিদিবেশ বসু

কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স্

১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন। কলিকাতা ৬

৫০·১

ভূমিকা

সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সংকলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি। অন্যের উপরেই দিতাম। কেননা, কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কি না হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।

কিন্তু, এই সংকলন উপলক্ষে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা করে এ কাজে হাত দিয়েছি। যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের যে-সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।

মনে আছে কোনো-এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন-সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে লেখক উদ্ধৃত করে-ছিলেন, যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়। কেউ কেউ সেগুলিকে ভালোও বাসেন, সেই দুর্গতির জন্যে আমি দায়ী। প্রবন্ধলেখককে দোষ দিতে পারি নে, কেননা লেখায় যে অপরাধ করেছি ছাপার অক্ষরে তাকে সমর্থন করা হয়েছে।

যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন, ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি, লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে, সে কথা বলবার স্থান এ নয়।

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষি করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেইরকম। ওই তিনটি কবিতা-গ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ— লেখাগুলি

কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠে নি— এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে।

ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর-কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।

তার পর মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছা করেছি তার অনেকগুলিই দেওয়া হল না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসর হতে হতে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীতমনে আত্মসংবরণ করেছি।

এ-রকম সংকলন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। মনের অবস্থা-পরিবর্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচার না হয়ে যায় না।

আমার লেখা যে-সকল কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘকাল পাঠকদের পরিচিত, এই গ্রন্থে তাদেরই থেকে বিশেষ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সেগুলি যথাস্থানে পূর্ণতর পরিচয়ের অপেক্ষায় রইল।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৩৮

সূচীপত্র

সূচীপত্রে, উল্লিখিত গ্রন্থের পরেই সংকলিত কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল মুদ্রিত হইল। যে ক্ষেত্রে উহা জানা নাই, * চিহ্নে প্রথম প্রচারের বা মুদ্রণের কাল দেওয়া গেল

সোনার তরী : ১২৯৮ ফাল্গুন - ১৩০০ অগ্রহায়ণ পৃষ্ঠাঙ্ক

বিদায়-অভিশাপ : ১৩০০ শ্রাবণ

চিত্রা : ১২৯৯ চৈত্র - ১৩০২ ফাল্গুন

চৈতালি : ১৩০২ চৈত্র - ১৩০৩ শ্রাবণ — পৃষ্ঠাঙ্ক

কণিকা : ১৩০৬ অগ্রহায়ণ *

কল্পনা : ১৩০৭ বৈশাখ * পৃষ্ঠাঙ্ক

কথা : ১৩০৪ কার্তিক - ১৩০৬ অগ্রহায়ণ

পৃষ্ঠায়

খেয়া : ১৩১২ শ্রাবণ - ১৩১৩ আষাঢ় পৃষ্ঠাঙ্ক

গীতাঞ্জলি : ১৩১৩ - ১৩১৭ শ্রাবণ

গীতিমাল্য : ১৩১৮ চৈত্র - ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ

গীতিমাল্য : ১৩১৮ চৈত্র - ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ পৃষ্ঠাঙ্ক

গীতালি · ১৩২১ ভাদ্র-কার্তিক

বলাকা : ১৩২১ বৈশাখ - ১৩২২ কার্তিক পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

গীতবিতান : ১৩১৮ মাঘ - ১৩৪৬ ভাদ্র * পৃষ্ঠাঙ্ক

লেখন : ১৩৩৩ *

লেখন : ১৩৩৩ * | পৃষ্ঠাঙ্ক

স্ফুলিঙ্গ : ১৩৫২ *

চিত্রসূচী

৩, ৪, ৫ ও ৭ -সংখ্যক লিপিচিত্র যথাক্রমে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅমল হোম ও শ্রীমতী সীতাদেবীর সৌজন্যে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। গ্রন্থে মুদ্রিত প্রতিকৃতি-চিত্রখানি ১৯৩৫ সনের একখানি আলোকচিত্র-অনুযায়ী, চিত্রগ্রহীতা: Raymond Burnier।

মরণ

মরণ রে,

তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।

মেঘবরন তুঝ, মেঘজটাজুট,

রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,

তাপবিমোচন করুণ কোর তব

মৃত্যু-অমৃত করে দান।

তুঁহুঁ মম শ্যামসমান॥

মরণ রে,

শ্যাম তোঁহারই নাম।

চির বিসরল যব নিরদয় মাধব

তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।

আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,

ঝরই নয়ন-দউ অনুখন ঝরঝর,

তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,

তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।

মরণ তু আও রে আও॥

ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,

আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,

কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি

নীদ ভরব সব দেহ।

তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,

রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,

হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,

অতুলন তোঁহার লেহ॥

দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
'রাধা রাধা রাধা'।
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জবাট'পর অবহুঁ ম ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগনভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয়তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয়বাধা সব অভয়মূর্তি ধরি
পন্থ দেখায়ব মোর।
ভানুসিংহ কহে, ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি—
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি॥

প্রশ্ন

কো তুঁহু বোলবি মোয়।
হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখউপর তুঁহু রচলহি আসন—
অরুণ নয়ন তব মরমসঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়॥

হৃদয়কমল তব চরণে টলমল,
নয়নযুগল মম উছলে ছলছল—
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয় ॥

বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয়গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে—
উতল প্রাণ উতরোয় ॥

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল—
চরণকমলযুগ ছোঁয় ॥

গোপবধূজন বিকশিতযৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন—
নীলনীর'পরে ধীর সমীরণ
পলকে প্রাণমন খোয় ॥

তৃষিত আঁখি তব মুখ'পর বিহরই,
মধুর পরশ তব রাধা শিহরই—
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয় ॥

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি—
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ'পর গোয় ॥

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখিদুটি,
চাহিলে হৃদয়-পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে—
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাও নি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শান্তিময় পুরবীরাগিণীতানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।
আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য-'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।
সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান।

চারি মুখে বাহিরিল বাণী,
চারি দিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা-অন্ধকারে
সীমাশূন্য ব্যোমপারাবারে
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো,
আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।

আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ময় জটাজাল কোটিসূর্যপ্রভা বহি
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে।

জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
স্তব্ধতার পাষাণহৃদয়
শত ভাগে গেল বিদারিয়া।

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া
চারি দিকে চারি হাত দিয়া
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ।
লইয়া মঙ্গলশঙ্খ করে
কাঁপায়ে জগৎ-চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।

থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।
জগতের মহাবেদব্যাস
গঠিলা নিখিল-উপন্যাস
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
মহাছন্দ মহা-অনুপ্রাস
শূন্যে শূন্যে বিস্তারিল পাশ॥

অতল মানসসরোবরে
বিষ্ণুদেব মেলিল নয়ন।
আলোককমলদল হতে
উঠিল অতুল রূপরাশি।
ছড়ালো লক্ষ্মীর হাসিখানি—
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলদল।
জগতের মত্ত কোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি॥

মহাছন্দে বন্দী হল যুগ-যুগ যুগ-যুগান্তর—
অসীম জগৎ-চরাচর
অবশেষে শ্রান্তকলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল আকুল আর্তস্বর—
'জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি
হয়েছে বিশ্রান্ত কলেবর,
আমারে নূতন দেহ দাও।
গাও, দেব, মরণসংগীত—
পাব মোরা নূতন জীবন।'

জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর,
তিন-কাল-ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক্-দিগন্তর।
প্রলয়পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদি-অন্ত থরথর থরথর
উঠিল কাঁপিয়া।
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল জগতের সমস্ত বাঁধন।
উঠিল অসীম শূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল।
মহা-অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া—
জগতের মহাচিতানল।

খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো
বরষিছে চারি দিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
মুহূর্তেই যেতেছে মিশায়ে।
সৃজনের আরম্ভ-সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত-আকাশ-গ্রাসী অনলসমুদ্র-মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান।
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।

হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়—
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে— প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর—
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
প্রভাত হল যেই কী জানি হল একি,
আকাশ-পানে চাই কী জানি কারে দেখি।

পুরবমেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা,
অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।

আকাশ, 'এসো এসো' ডাকিছ বুঝি ভাই—
গেছি তো তোরি বুকে, আমি তো হেথা নাই।
প্রভাত-আলো-সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও।
আকাশপারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে।

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর।
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহার শিকল-ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগী, বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে, দেখি কে খুলিতে পারে।
জগৎ-মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণপ্রাণ চিরশৃঙ্খল চরণ জড়ায়ে ধ'রে—
একবার তোরে দেখেছি যখন কেমনে এড়াবি মোরে?
চাও নাহি চাও, ডাকো নাই ডাকো,
কাছেতে আমার থাকো নাই থাকো,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়, রব গায় গায় মিশি—
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ, এ অশ্রুজল, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্যের মতন বাজিবে সাথে সাথে দিবানিশি।

নিত্যকালের সঙ্গী আমি যে, আমি যে রে তোর ছায়া—
কিবা সে রোদনে কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে
কভু সম্মুখে কভু পশ্চাতে আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে একাকী যখন বসিয়া মলিনপ্রাণে
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে
চেয়ে তোর মুখপানে।

যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
যে দিকে চাহিবি আকাশে আমার আঁধার মুরতি আঁকা-
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে, জগৎ পড়িবে ঢাকা।
দুঃস্বপনের মতো চিরকাল তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবসরজনী এ মুখ দেখিব তোমার নয়ননীরে।
চিরভিক্ষার মতন দাঁড়ায়ে রব সম্মুখে তোর।
'দাও দাও' ব'লে কেবলি ডাকিব, ফেলিব নয়নলোর।
কেবলি সাধিব, কেবলি কাঁদিব, কেবলি ফেলিব শ্বাস,
কানের কাছেতে প্রাণের কাছেতে করিব রে হাহুতাশ
মোর এক নাম কেবলি বসিয়া জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন দিবসরজনী পায়েতে বিঁধিয়ে রব।
গত জনমের অভিশাপ-সম রব আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্ট-হেন বেড়াইব পাছে পাছে।

যেন রে অকূল সাগর-মাঝারে ডুবেছে জগৎ-তরী,
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী—
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস ছাড়াতে, ছাড়িব না তবু মহাসমুদ্র-'পরি
পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ,
পলে পলে তোর বাহু বলহীন—
দোঁহে অনন্তে ডুবি নিশিদিন, তবু আছি তোরে ধরি

রোগের মতন বাঁধিব তোমারে দারুণ আলিঙ্গনে—
মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর কিছু না রহিবে মনে।

ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি, কেবল দেখিবি মোরে—
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি চাহিয়া দেখিছে তোরে।
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই শুনিবি আঁধারঘোরে
কোথা হতে এক ঘোর উন্মাদ ডাকে তোর নাম ধ'রে।
নিরজন পথে চলিতে চলিতে সহসা সভয় গণি
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি আমার হাসির ধ্বনি।

হেরো তমোঘন মরুময়ী নিশা—
আমার পরান হারায়েছে দিশা,
অনন্ত ক্ষুধা অনন্ত তৃষা করিতেছে হাহাকার।
আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে
এ চিরযামিনী ছাড়িব কী করে,
এ ঘোর পিপাসা যুগযুগান্তে মিটিবে কি কভু আর।
বুকের ভিতরে ছুরির মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন রব আমি অনিবার।

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়—
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরাময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া এই তো নিয়ম ভবে—
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে।

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময় —
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

পুরাতন

হেথা হতে যাও পুরাতন,
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ-'পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
পাখিরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা-বালকে।

সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর—
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে,
শুনিছে পাতার মরমর।
কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,
সবাই তো ভুলে আছে, কেহ হাসে কেহ নাচে—
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!
বাতাস যেতেছে বহি, তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস!
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ-উচ্ছ্বাস!
উঠিছে প্রভাতরবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায় তারে তো কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে ধরার পানে চায়,
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কী দেখিতে আসিয়াছ— যাহা-কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝ'রে-পড়া পাতার মতন—
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন,
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।

ঢাকো তবে ঢাকো মুখ, নিয়ে যাও দুঃখ সুখ,
চেয়ো না, চেয়ো না ফিরে ফিরে—
হেথায় আলয় নাহি— অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

নূতন

হেথাও তো পশে সূর্যকর!
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরিশিখর,
বিশাল পর্বত কেটে পাষাণহৃদয় ফেটে
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর,
প্রভাতে পুলকে ভাসি বহিয়া নবীন হাসি
হেথাও তো পশে সূর্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়—
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়।
হেরো হেরো, হায় হায়, যত প্রতিদিন যায়
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজাল—
লতাগুলি লতাইয়া বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের নিরাশার অতিথের
ঘোর স্তব্ধ সমাধি-আবাস
ফুল এসে পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস।
এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
গৃহহারা আনন্দের দল—

বিশ্বে তিল শূন্য হলে অনাহূত আসে চলে,
বাসা বেঁধে করে কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর—
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়,
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশালকায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া,
তারে এরা করে না তো ভয়—
চারি দিক হতে তারে ছোটো ছোটো হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই-যে রে মরুস্থল দাবদগ্ধ ধরাতল,
এখানেই ছিল পুরাতন—
একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তার দক্ষিণপবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে—
শুষ্ক শাখা, শুষ্ক ফুলদল!
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন,
আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন!
নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ তোর হাসি গান।

ফোটা নব ফুলচয়, ওঠা নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক— সব তার নিয়ে যাক,
নাম তার যাক মুছে দিয়ে॥

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ্ ঠঙ্।
ও পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় এক-শো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা—
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়, কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

মনে পড়ে ঘরটি আলো, মায়ের হাসিমুখ—
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্মি সে না যায় লেখাজোকা।

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি—
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে, সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারি দিকের দেয়াল জুড়ে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্—ঝুপ্—ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে, একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা—
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা!
সেদিনও কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা!
থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা!
তিন কন্যে বিয়ে করে কী হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্তকানন-মাঝে বসন্তসমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত।

তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো।
জগৎ-কমলবনে কমল-আসনা
কত দিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।
সে এল না— এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর।
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর।

চুম্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে—
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে—
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন—
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা—
কাহারে কাঁদিয়া বলে, 'যেয়ো না, যেয়ো না!'
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা!
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা,
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অক্ষরে।
পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা,
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে।
কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা,
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির-আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।

চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশস্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায়।

যৌবনসংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে—
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল—
এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায়
লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল॥

হৃদয়-আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখিতারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি,
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন,
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনকবরন—
হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয়চকোর চাবে হাসির কিরণ॥

স্মৃতি

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব-জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ—
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই-সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন॥

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি যে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয়-সযতন-গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায় সেই কোমল আসনে
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়

কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায় !
কত-না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাসবায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনি রাতে দুটি অশ্রুকণা।
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপনশয়নে ?।

বন্দী

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস—
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান.
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ '
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান !
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ ;
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্য-পানে দেখি মুখ তুলি—
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ ;
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়॥

কেন

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি—
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া!
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে—
হায়, যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায়, যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে!
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবই যদি ছায়া!
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল—
এরই তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া!
মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা—
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা!

মোহ

এ মোহ ক' দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে—
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!

কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত—
কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর!
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণপরিপূর্ণ মরণ-অনল—
মনে প'ড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?॥

মরীচিকা

এসো, ছেড়ে এসো, সখী, কুসুমশয়ন—
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুমবনে স্বপনচয়ন!
দেখো, ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা—
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে!
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা নির্মল অনলে।
চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে
সুখে দুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান,
'মিলায় মিলায়' বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥

ভুলে

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সে দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না, এসেছি ভুলে।

বেলকুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি অধর খোলা।
মনে পড়ে গেল সে কালের সেই কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার গগনমূলে।
সে দিন যে গেছে ভুলে গেছি, তাই এসেছি ভুলে।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়ে না মনে।
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি,
লাজে-বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস নয়নকূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই এসেছি ভুলে।

কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি, আমরা ভুলি—
সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায় কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণকিরণ কোমল করিয়া—
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায় কাহার চুলে!
কেহ ভোলে কেউ ভোলে না যে, তাই এসেছি ভুলে।

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি!
দখিনে বাতাসে কেহ নাই পাশে সাধের সাথি।
চারি দিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়—
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে, বিকচ ফুলে।
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ, আসিলে ভুলে?

বৈশাখ ১২৯৪

ভুল-ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর।
মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপিচুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর॥

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা অধরকোণে।
আপনারে আর চাহ না লুকাতে আপন মনে।
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে নয়নলোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না শরম চোর॥

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবনহত।

কে জানে কাননে ফুল ফোটে কিনা—
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা—
কে জানে সে ফুল তোলে কিনা কেউ ভরি আঁচোর,
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কিনা সারা প্রহর ॥

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল কঠিন ফাঁসি।
মধুনিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা হৃদয়ে তোর—
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ মিছে আদর ॥

কতই যা জানি জেগেছ রজনী করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার মলিন মুখে।
পরদুখভার সহে নাকো আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার—
তবু আসি আমি, পাষাণ হৃদয় বড়ো কঠোর।
ঘুমাও ঘুমাও— আঁখি ঢুলে আসে ঘুমে-কাতর।

কলিকাতা
বৈশাখ ১২৯৪

বিরহানন্দ

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত,
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।

কখনো ফুল-দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝ'রে পড়িত রে নিশাসি ॥

তবু সে ছিনু ভালো আধা-আলো- আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সে তো ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে ॥

বিরহপরিপূত ছায়াযুত শয়নে
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত-দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে।
কোকিল কুহুতানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা- গহনে ॥

আকাশে চাহিতাম, গাহিতাম একাকী—
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি!
দিবস-নিশি ধ'রে ধ্যান ক'রে তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি!
তটিনী অনুখন ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি?॥

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে-ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।

মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা- স্বপনে।

সারাটা দিনমান রচি গান কত-না,
তাহারি পাশে রহি যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত যেন দিশে তাহারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তাহারি যত কথা পাতা লতা ঝরনা।

তাহারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখনো দেখি যেন ম্লান-হেন মুখানি,
কখনো আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।
কখনো সারারাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে!
মিলনদাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।
কই সে দেবী কই! হেরো ওই একাকার,
শ্মশানবিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর।
সকলই করে ধুধু, প্রাণ শুধু শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

সিন্ধুতরঙ্গ

পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর
নিমজ্জন-উপলক্ষে

দোলে রে প্রলয়দোলে অকূল সমুদ্র-কোলে
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র-সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে
নিখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারি ধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদগর্জনে
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে,
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল—
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশ দিশি
উঠেছে নড়িয়া,
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠেছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ!
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হুতাশে—
দিগ্বিদিক্ নাহি জানে, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে,
ছুটেছে প্রলয়-পানে আপনারি ত্রাসে।
হেরো, মাঝখানে তারি আটশত নরনারী
বাহু বাঁধি বুকে
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
'দাও দাও দাও'
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে কোটি ঊর্ধ্বকরে বলে
'দাও দাও দাও'।
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে ফেনায়ে ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরু ভার সহিতে পারে না আর,
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে।
অধ ঊর্ধ্ব এক হয়ে ক্ষুদ্র এ খেলনা লয়ে
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে, 'ভগবান,
হায় ভগবান!'
'দয়া করো, দয়া করো' উঠিছে কাতর স্বর,
'রাখো রাখো প্রাণ!'

কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ,
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল !
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার—
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল !
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার—
সহস্র করাল মুখ সহস্র-আকার ॥

ফেটেছে তরণীতল সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস ।
নাই তুমি ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ—
জড়ের বিলাস ।
ভয় দেখে ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়—
নিদারুণ 'হায় হায়' থামিল চকিতে ।
নিমেষেই ফুরাইল— কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে ।
যেন রে একই ঝড়ে নিভে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো—
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো ॥

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন ।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন !
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে—
মধুর রবির করে কত ভালোবাসা-ভরে
কত দিন খেলা করে কত সুখে দুখে ।

কেন করে টলমল্ দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা॥

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিলমানব!
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণদানব!
ওই-যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে,
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন!
মরণের মুখে ধায় সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন।
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে,
এক ধারে নারী—
দুর্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি॥

এ বল কোথায় পেলে— আপন কোলের ছেলে
এত করে টানে!
এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে!
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব অমৃত-পানে অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান, সে কি মাতৃহীন?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননী-প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী—
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী?॥

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
এক সাথে রয়।
কেবা সত্য কেবা মিছে নিশিদিন আকুলিছে—
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড়দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিকো মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়—
চিরদিন অন্তহীন জয় পরাজয়।

কলিকাতা
আষাঢ় ১২৯৪

নিষ্ফল কামনা

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি-আঁখি-মাঝে।

খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি!

যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায় !
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড়তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষাপারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন।

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা—
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস !
কী আছে বা তোর !

কী পারিবি দিতে !
আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো-অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল—
এরই মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব.
কেহ নহে তোমার আমার ।
অতি সযতনে
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—

সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের॥

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই॥

১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্,
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা॥

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি তুলে চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?॥

কেন আন' বসন্তনিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল

যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?।
আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয়— প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান ॥

মনে আছে, সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরৎকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীতবায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ ॥

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল—
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি—
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে-বিষাদে-মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জান না তাহা আমি তাহা জানি।

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে কোন্ আকর্ষণডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলনব্যাকুলতা—
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি,
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা ॥

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপিচুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া॥

আজ তুমি দেখেও দেখ না
সব কথা শুনিতে না পাও।
কাছে আস আশা ক'রে আছি সারা দিন ধরে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও॥

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে
বসে আছি সন্ধ্যায় কজনা,
হয়তো বা কাছে এস, হয়তো বা দূরে বস,
সে-সকলই ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা॥

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে।
সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি—
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে॥

দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ।
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ॥

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ!
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটিদুই-তিন॥

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ?।

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা)
প্রেম দেয় কতখানি— কোন্ হাসি, কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা।

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা—
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে চলে যাওয়া, এই কাছে আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

২১ অগ্রহায়ণ ১২৯৪

পুরুষের উক্তি

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবনপথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন।

তখন উষার আধো আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার—
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্যযাতনা,
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া—
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা।

আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়—
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।

অনন্ত বাসরসুখ যেন
নিত্যহাসি প্রকৃতিবধূর—
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখির অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃত-ময়—
প্রেম চিরদিন রয় এ চিরজীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণকিরীট মাথে
তরুণদেবতাসম দাঁড়ানু সমুখে।

পত্রপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে—
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর ॥

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল্—
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল ॥

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্ধ্বমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ-স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ—

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুররহস্যময় সৌন্দর্য তোমার ॥

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা সেই আধো চোখে দেখা,
চুপিচুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা—

অজানিত সকলই নূতন—
অবশ চরণ টলমল্—
কোথা পথ কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল ॥

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি,
কী যে রাখি কী যে ফেলি বুঝিতে পারি নে।

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস—
কুসুমিত ছায়াতরুতলে
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি ব'সে ফুলদল,
ধূলি সেও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া—
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে ওঠে হায়-হায়,
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

মনে হয়, এ কি সব ফাঁকি!
এই বুঝি, আর কিছু নাই!
অথবা যে রত্ন-তরে এসেছিনু আশা করে
অনেক লইতে 'গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে বসি
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা—
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরই মাঝে ক্লান্তি কেন আসে!
উঠিবারে করি প্রাণপণ—
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
শরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যানধারণার।
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন—
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার?

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা এই নিশা, এই ক্ষুধা এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে॥

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে—
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে,
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে॥

সৌন্দর্যসম্পদ মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই— তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনি হল যদি কমল-আসনা।

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে
কখনো বসন্তসমীরণে
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপাররহস্যময়ী
আনন্দমুরতিখানি জেগে ওঠে মনে॥

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীনযৌবনময় প্রাণে—
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না, চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্‌ পুষ্প-অর্ঘ্য-ভার।

কলিকাতা
১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪

বধূ

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্‌'
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জলকে চল্‌'।

কলসী লয়ে কাঁখে, পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবনে হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনি-ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট—
পাখির গান কই, বনের ছায়া।

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে,
অবাক হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
'কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে!
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে!'

কেহ বা দেখে মুখ, কেহ বা দেহ—
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি—
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইটের 'পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নবশশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো?
হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগ'—
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগ'।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

নিমেষ-তরে তাই আপনা ভুলি
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি॥

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো!
সদাই মনে হয়— আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্।'
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্॥

১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫
পরিবর্ধন: শান্তিনিকেতন: ৭ কার্তিক

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ।
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি—
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি॥

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন—
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতা-ভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন—

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা—
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে।

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা—
করিত দক্ষিণবায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়,
প্রান্তরের প্রান্তদিশে মেঘে বনে যেত মিশে—
জুঁইগুলি বিকশিত বিকালবেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি—
সুখদুঃখ ভাগ লয়ে প্রতিদিন যায় বয়ে,
গোপন স্বপন লয়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে-ভয়ে-থরথর ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়।

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপাশাখে সোনা-ফুল ফুটে থাকে—
সেই তারা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল—
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালোবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙিয়া দেখে নি কেহ হৃদয়-গোপন-গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে ॥

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি—
পল্লবের সুচিকণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি ধুলায় হায় যাই গড়াগড়ি ॥

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে ॥

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কী বলিয়া !
ভুল করে এসেছিলে ? ভুলে ভালোবেসেছিলে ?
ভুল ভেঙে গেছে, তাই যেতেছ চলিয়া ?।

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বৈ কাল—
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল ॥

এ কী নিদারুণ ভুল, নিখিলনিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে ?।

ভেবে দেখো, আনিয়াছ মোরে কোন্‌খানে—
শতলক্ষ-আঁখি-ভরা কৌতুককঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে ॥

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনাবেশে ॥

১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

পরিবর্ধন : শান্তিনিকেতন : ৭ কার্তিক

গুপ্ত প্রেম

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে ?
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে ?।

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায় ।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কী ব'লে আপনারে দিব তায় ?।

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি শরমে ।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে ।

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে ।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে ।

দেখো বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে ।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া,
আপন আলো দিয়া লেখা সে ।

তবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহন রূপ তাই ধরিছে ।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই,
পরান কেঁদে তাই মরিছে ।

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরানে আছে যাহা জাগিয়া—
তাহারে লয়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া ॥

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়,
কুরূপ দেহ-মাঝে উদিয়া,
প্রাণের এক ধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তারে রুধিয়া ।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহি নে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা ।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা ।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনো-আশা দলে যাই—
পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে 'এ কে'
দু হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই ।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাবে 'এও কি প্রেম জানে—
আমি তো এর পানে চাহি নি' ।

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে ।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে ।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

অপেক্ষা

সকল বেলা কাটিয়া গেল, বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্তছবি কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী-পানে— বিদায় নাহি চায়॥

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে, মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে, কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে—
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া মেলিয়া ঘাটে বাটে॥

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘদিন ছিল সে বসে মিলনহীন,
এখনো তার বিরহগাথা বিরাম নাহি মানে॥

বধূরা দেখো আইল ঘাটে, এল না ছায়া তবু।
কলসঘায়ে ঊর্মি টুটে, রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্তনীর চুম্বি যায় কভু॥

দিবসশেষে বাহিরে এসে সেও কি এতখনে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে নেমেছে সেই নিভৃত নীরে
প্রাচীরে-ঘেরা ছায়াতে-ঢাকা বিজন ফুলবনে?॥

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায় অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি করিছে কানাকানি॥

কপোলে তার কিরণ প'ড়ে তুলেছে রাঙা করি,
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের 'পরে ছড়ায়ে পড়ে আঁচল খসি পড়ি॥

জলের 'পরে এলায়ে দিয়ে আপন রূপখানি,
শরমহীন আরামসুখে হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে দিয়েছে পাতা টানি॥

সলিলতলে সোপান-'পরে উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া জলের 'পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া করিছে পরিহাস॥

আম্রবন মুকুলে-ভরা গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখি আপন-মনে উঠিছে ডাকি,
বিবশ হয়ে বকুল ফুল খসিয়া পড়ে নীরে॥

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে, মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা আকাশশেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির 'পরে ভুরুর মতো কালো॥

বুঝি-বা তীরে উঠিয়াছে সে জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে, সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে—
যৌবনলাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে॥

মাজিয়া তনু যতন ক'রে পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি' আঁচল টানি, আঁটিয়া লয়ে কাঁকনখানি,
নিপুণ করে রচিয়া বেণী বাঁধিবে কেশপাশ॥

উরসে পরি যূথীর হার, বসনে মাথা ঢাকি,
বনের পথে নদীর তীরে অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মতো রাখি॥

বাজিবে তার চরণধ্বনি বুকের শিরে শিরে।
কখন্ কাছে না আসিতে সে পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন ক'রে দখিনবায়ু জাগায় ধরণীরে॥

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে আর কি হবে কথা!
ক্ষণেক শুধু অবশকায় থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু সুখের আকুলতা॥

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হয়ে বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে, আলোতে করে দূর—
যেমন দুটি ব্যথিত প্রাণে দুঃখনিশি নিকটে টানে
সুখের প্রাতে যাহারা রহে আপনা-ভরপুর।

আঁধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়-মাঝে যতটা চাই ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়— হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,
ত্বরিতে যেন গিয়েছি দোঁহে জগৎ-পরপার।

দু দিক হতে দুজনে যেন বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে ব্যাকুলগতি, ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল নিশীথপারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত, থামিল কলতান,
মৌন এক মিলনরাশি তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি—
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে, পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস।

পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী—
কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি—
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্বলে কোথা সে পুণ্যজ্যোতি।

দেবের করুণা মানবী-আকারে,
আনন্দধারা বিশ্ব-মাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন এলেন পাপীর কাজে,
তোমার চরিত রবে নির্মল,
তোমার ধর্ম রবে উজ্জ্বল—
আমার এ পাপ করি দাও লীন তোমার পুণ্য-মাঝে।

তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী, লজ্জা নাহিকো তায়—
তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা-পানে চাও—
খুলে দাও মুখ, আনন্দময়ী, আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণমধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর—
উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল, উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি তোমারে দেখেছি চেয়ে?
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে—
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে নিশ্বাসরেখাছায়া
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা আকাশ-উষার কায়া?

লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায় লুব্ধ নয়ন হতে ?
মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্‌গুন্‌ কেঁদে তোমার দৃষ্টিপথে ?।

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম—
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই, ফুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ—
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক॥

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি-মুগ্ধ-মুরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জ্বালা,
চকিতত‌ড়িৎ সঘন বরষা, পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু—
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও মাগিতেছি অকপটে
তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশচিত্রপটে॥

ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা নিয়ে যায় টেনে;
মাধুরীমদিরা পান ক'রে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায় আমার বাঁশরি কাড়ি;
পাগলের মতো রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি।

আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশমন ;
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ বসন্তসমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে ;
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।
চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা কল্পমুরতি কত ;
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া যেন বিভোরের মতো ॥

শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী, বীণা খসে যায় পড়ি ;
নাহি বাজে আর হরিনামগান বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে ;
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল অকূল লবণনীরে।
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে—
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা লোপ করো একেবারে ॥

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি পশেছে জীবনমূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে নিখিলের শোভা যত—
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে জগৎ ছায়ার মতো ॥

যাক, তাই যাক, পারি নে ভাসিতে কেবলই মুরতিস্রোতে—
লহ মোরে তুলে আলোকমগন মুরতিভুবন হতে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে, একাকী অসীম-ভরা
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন, মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া রব আমি বারো মাস ॥

থামো একটুকু ; বুঝিতে পারি নে, ভালো করে ভেবে দেখি
বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল রবে সে কি ?

ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে নাকি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি ?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে দেবীর প্রতিমা -সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড়তিমির কেশে—
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে ;
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপাগাছ, দূর সরযূর রেখা,
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে চিরদিন যাবে দেখা।
সে নব জগতে কালস্রোত নাই, পরিবর্তন নাহি—
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন রবে চাহি।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ— দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক্‌-না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

২২ ও ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

ভৈরবী গান

ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি
  বিষাদশান্ত শোভাতে !
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই প্রভাতে—
মোর গৃহছাড়া এই পথিকপরান

তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন বিকলি।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেমবাহু-ঘেরা
অশ্রুকোমল শিকলি
হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলই।

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষবার—
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন
মুখ মনে পড়ে সে-সবার।

এই সংকটময় কর্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।
তবে ফিরে যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান,
তরুমর্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জভবনে,
সেই কুহুকুহরিত বিরহরোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে।

সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে॥

হায়, অতৃপ্ত যত মহৎবাসনা
গোপনমর্ম্মদাহিনী,
এই আপনা-মাঝারে শুষ্ক জীবনবাহিনী।
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশাকাহিনী॥

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,
'হল না, কিছুই হবে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু রবে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হতে তুলি লবে না॥

'যদি কাজ নিতে হয় কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে॥

'শেষে দেখিব পড়িল সুখযৌবন
ফুলের মতন খসিয়া—

হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে গেল শ্বসিয়া,
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেইখানে আছে বসিয়া ॥

'শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চিরজীবনের তিয়াষে।
এই দগ্ধ হৃদয় এতদিন আছে কী আশে!
সেই ডাগর নয়ন, সরস অধর
গেল চলি কোথা দিয়া সে!'

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না ॥

ওই কুহকরাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে!
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন দিবসে,
পথে রাক্ষসী সেই তিমিররজনী
না জানি কোথায় নিবসে ॥

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসারপথ তরিয়া

যত মানবের গুরু মহৎজনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া ॥

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরান বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে কাঁদিয়া।
তারা প'ড়ে ভূমিতলে ভাসে আঁখিজলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া ॥

হায়, উঠিতে চাহিছে পরান, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তারা পারে না ললিত লতার বাঁধন টুটিতে।
তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে ॥

তারা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,
রবে দূর আলো-পানে আবিষ্টপ্রাণে চাহিয়া।
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তারা
দিবসরজনী বাহিয়া ॥

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দুলাবে ॥

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবনকাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে॥

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়—
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়॥

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি,
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব—
আঁধারে মিশে গেছে আর সব॥

বলিতে ব্যথিবে না নিজ কান,
চমকি উঠিবে না নিজ প্রাণ।
সে কথা আঁখিনীরে   মিশিয়া যাবে ধীরে,
বাদলবায়ে তার অবসান—
সে কথা ছেয়ে দিবে দুটি প্রাণ।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার!
শ্রাবণবরিষনে   একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার।

আছে তো তার পরে বারো মাস—
উঠিবে কত কথা, কত হাস।
আসিবে কত লোক, কত-না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ—
জগৎ চলে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে   রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

রোজ বাজ়্। খিড়কি
৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার—
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার॥

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী, প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহমিলনকথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া তোমারি মুরতি এসে
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে॥

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগলপ্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে, মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে॥

আজি সেই চির-দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
২ ভাদ্র ১২০৬

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন—
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিন-বায়ু-ভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া॥

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়
তাহারি চরণের শরণের লালসে॥

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপহার উপহার চরণে—
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে—
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৯ ভাদ্র ১২৯৬

ভালো করে বলে যাও

ওগো, ভালো করে বলে যাও।
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে সে কথা বুঝায়ে দাও।
যদি না বলিবে কিছু তবে কেন এসে মুখপানে শুধু চাও ॥

আজি অন্ধতামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা সবগুলি গেছে মিশি।
শুধু বাদলের বায় করি হায়-হায় আকুলিছে দশ দিশি ॥

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চলমাঝে ঢাকিব তোমায় নিশীথনিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি বক্ষে লইব তুলে ॥

সেথা নিভৃতনিলয়সুখে
আপনার মনে বলে যেয়ো কথা মিলনমুদিত বুকে।
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল, চাহিব না মুখে মুখে ॥

যবে ফুরাবে তোমার কথা
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া চিত্রপুতলি যথা।
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি মর্মর তরুলতা ॥

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে ক্ষণেকের তরে চাব দুঁহু দোঁহা-পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে জলভরা দুনয়ানে ॥

তবে ভালো করে বলে যাও।
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাবিতে সে কথা বুঝায়ে দাও।
শুধু কম্পিত সুরে আধো ভাষা পুরে কেন এসে গান গাও ॥

শান্তিনিকেতন। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত ! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘনসংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে ।

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব !
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে । ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি প্রিয়গৃহ-পানে ? বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্প-ভরা— দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতলশয়নে
মুক্তকেশে, ম্লানবেশে, সজলনয়নে ?।

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে খুঁজি বিরহিণী প্রিয়া ?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন, গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন-পানে। ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনাসম, শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার॥

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষন
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিণীসম॥

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি

ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন।
সে-সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে॥

ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আছি সেই শ্যামবঙ্গদেশে
যেথা জয়দেব কবি কোন্ বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর॥

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি— আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া॥

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত। গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি, বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা,
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা

বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে
বনস্পতি ! না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল ।
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন গগনে নেহারি
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘ-পানে ,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে !
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে ; সহসা আসিতে মহা ঝড
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, 'মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !'
কোথায় অবন্তীপুরী, নির্বিন্ধ্যা তটিনী,
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ! সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত , শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
কচিৎবিদ্যুতালোকে । কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ! কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল ।

এইমতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি। সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে,
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা—
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণশশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়, হেরি, চারি ধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম। ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা। প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান—
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?

কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে!

শান্তিনিকেতন
৭ ও ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

অহল্যার প্রতি

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্যতপোবনচ্ছায়ে! আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত-আত্মা-মাঝে? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষকোটি পরানির মিলন কলহ—
আনন্দবিষাদক্ষুব্ধ ক্রন্দন গর্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপনিদ্রা ভেদ ক'রে
কর্ণে তোর— জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধজাগরণে?

বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্যনিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর?

যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্রপথে মরুদিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত
অনুর্বরা-অভিশাপ তব; সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে ?।

যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষ-'পরে। দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব— জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক।
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটিজীবস্পর্শসুখ,
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?
যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে— সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে—
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝ'রে প'ড়ে যায়

দিবাতাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ উল্কা তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা ॥

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা। দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর সরল শুভ্র। হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহুবর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরস ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে ॥

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ। হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে চিনে। দেখিতে দেখিতে
চারি দিক হতে সব এল চারি ভিতে
জগতের পূর্ব পরিচয়। কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার, থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে ॥

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়—
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়মাঝে নব পরিচয়॥

শান্তিনিকেতন
১১ ও ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

আমার সুখ

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুঁথি -সম?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পারো ভ'রে।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখো এ পরানে ধরিয়াছে
কত ভালোবাসা॥

সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে!

দেখিতে পাও নি যদি দেখিতে পাবে না আর
মিছে মরি ব'কে।
আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি—
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই!

লোহিতসমুদ্র। ১২ কার্তিক ১২৯৭

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু ধারে—

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে ?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে ।
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে দাও—
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥

যত চাও তত লও তরণী-'পরে ।
আর আছে ?— আর নাই, দিয়েছি ভরে ।
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে ॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি ।
শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

বোট । শিলাইদহ । ফাল্গুন ১২৯৮

নিদ্রিতা

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার—
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া ।
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশিভোর ।
আকাশকোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙে নি ঘুমঘোর ।

সম্মুখে প'ড়ে দীর্ঘ রাজপথ,
দু ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি সুদূর পানে চেয়ে
আপন-মনে ভাবিনু একবার—
অরুণ-রাঙা আজি এ নিশিশেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে
দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা ॥

অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু,
কত যে দেশ বিদেশ হনু পার!
একদা এক ধূসরসন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।
প্রাসাদ-মাঝে পশিনু সাবধানে,
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রানীমাতা,
কুমার-সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা।
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা ॥

কমলফুলবিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।

মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষ-'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি—
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।
দেখিনু তারে, উপমা নাহি জানি—
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন।
ভূতলে বসি আনত করি শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
তাহারি পানে চাহিনু একমনে—
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।
ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নামধাম।
লিখিনু, 'অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।'

যতন করি কনক-সুতে গাঁথি
রতন-হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি—
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা॥

শান্তিনিকেতন
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম, উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি, কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া, হস্তীশালে হাতি।
মল্লশালে মল্ল জাগি ফুলায় পুন ছাতি।
জাগিল পথে প্রহরীদল, দুয়ারে জাগে দ্বারী,
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ, জাগিল রানীমাতা।
কচালি আঁখি কুমার-সাথে জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস, রতন-দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি শয্যাতলে শুধালো রাজবালা—
'কে পরালে মালা।'

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি নিল।
আপন-পানে নেহারি চেয়ে শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোখে চাহিল চারি দিকে—
বিজন গৃহ, রতন-দীপ জ্বলিছে অনিমিখে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে ধরিয়া দুটি করে
সোনার সুতে যতনে গাঁথা লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম, পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে পড়িল শতবার।

শয়নশেষে রহিল বসে, ভাবিল রাজবালা—
'আপন ঘরে ঘুমায়ে ছিনু নিতান্ত নিরালা,
কে পরালে মালা !'

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীনফুলমঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে বাঁশিতে উঠে তান।
শীতলছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি,
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে, চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি নয়ন দুটি ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা !'

বারেক মালা গলায় পরে, বারেক লহে খুলি—
দুইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি।
শয়ন-'পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে পাইবে যেন অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত-না ধ্বনি উঠিছে কত ছলে—
একটি আছে গোপন কথা, সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হুহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম ডাকিছে কুহু কুহু।
নিভৃত ঘরে পরান মন একান্ত উতলা,
শয়নশেষে নীরবে বসে ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা !'

কেমন বীর-মুরতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা—
দীপ্তিভরা নয়ন-মাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা।

স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়।
পার্শ্বে যেন বসিয়াছিল, ধরিয়াছিল কর,
এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর।
চমকি মুখ দু হাতে ঢাকে, শরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভে নি সেইক্ষণ!
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন-'পরে লুটায়ে প'রে ভাবিল রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

এমনি ধীরে একটি করে কাটিছে দিন রাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল লইয়া যূথীজাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝরঝর্,
কাননে ফুটে নবমালতী কদম্বকেশর।
স্বচ্ছহাসি শরৎ আসে পূর্ণিমামালিকা,
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে দীর্ঘ দুখনিশা,
শিশির-ঝরা কুন্দফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুন-মাস আবার এল বহিয়া ফুলডালা,
জানালা-পাশে একেলা বসে ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

শান্তিনিকেতন
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

হিং টিং ছট্

স্বপ্নমঙ্গল

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ—
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে—

একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলালো তারা, এল এক বেদে,
'পাখি উড়ে গেছে' ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে।
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্‌থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়্‌সুড়ি।
রাজা বলে 'কী আপদ', কেহ নাহি ছাড়ে—
পা দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখির মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌,
বেদে কানে কানে বলে— হিং টিং ছট্‌।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান॥

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে গেছে কথা নাহি মুখে,
চিন্তা যত ভারী হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড় তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে— হিং টিং ছট্‌।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,

গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান ॥

চারি দিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যখেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর-বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে বসে থাকে, বিষম সংকট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে— হিং টিং ছট্।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান ॥

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্ররাজ,
'ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ—
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে,
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।'
কটা-চুল নীলচক্ষু কপিশকপোল
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি—
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়,
'সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়—

কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্‌।'
সভাসুদ্ধ বলি উঠে— হিং টিং ছট্‌।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান॥

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
'ডেকে এনে পরিহাস' রেগেমেগে বলে।
ফরাসি পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা হস্ত রাখি বুকে,
'স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে,
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান,
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই? রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি—
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ, কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কী মিষ্ট আহা— হিং টিং ছট্‌।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান॥

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক্‌-ধিক্‌,
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক!
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্কবিকার
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার!
জগৎ-বিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি—
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে! দুপুরে ডাকাতি!

হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ,
'গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক।
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।'
সতেরো মিনিট-কাল না হইতে শেষ
ম্লেচ্ছপণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখচক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্বার উচ্চারিল— হিং টিং ছট্‌।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান ॥

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরু-মারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খ'সে খ'সে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণখর্ব দেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল।
সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার!
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলটপালট।'
সমস্বরে কহে সবে— হিং টিং ছট্‌।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,

গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান ॥

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট,
সংক্ষেপে বলিতে গেলে— হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান ॥

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারিধার—
সবে বলে, 'পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার!'
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্ররাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে—
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবুরাজা নড়িচড়ি উঠে।

ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক—
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশ-জোড়া মাথা-ধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল— হিং টিং ছট্।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে, নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা-কিছু
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলই মিথ্যা, সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শান্তিনিকেতন
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

পরশপাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণকলেবর।

ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধুলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারি হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান— সোনারুপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর—
দশা দেখে হাসি পায়, আর-কিছু নাহি চায়,
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর ॥

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্বগগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর!
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

একদিন বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।
মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে-ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে—
অতলের পানে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।
বহুকাল স্তব্ধ থাকি শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন।
তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল— লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎ-মাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর॥

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু—
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন, শ্রান্তিহীন—
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর-সব কাজ ভুলি আকাশে তরঙ্গ তুলি
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত।
যত করে হায়-হায় কোনোকালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু— ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহ তারা লয়ে চলে

অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর !
সেইমতো সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর ॥

একদা শুধালো তারে গ্রামবাসী ছেলে,
'সন্ন্যাসীঠাকুর এ কী, কাঁকালে ওকি ও দেখি ?
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে ?'
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার ! তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে— এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর ব'সে পড়ে ভূমি-'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা—
পাগলের মতো চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন্ ক'রে ঠেকাইত শিকলের 'পর—
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি,
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর ॥

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর— নুয়ে পড়ে দেহভার,
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ প'ড়ে আছে মৃতবৎ

হেথা হতে কত দূর, নাহি তার শেষ।
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনীছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর॥

শান্তিনিকেতন
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

দুই পাখি

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাখি বলে, 'না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।'

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি পড়ে শিখানো বুলি তার—
দোঁহার ভাষা দুইমত।

বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনের গান গাও দিখি!'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি ভাই,
খাঁচার গান লহো শিখি।'
বনের পাখি বলে, 'না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
আমি কেমনে বনগান গাই।'

বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘন নীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারি ধার।'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখি বলে, 'না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!'

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।

দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে, 'কাছে আয়।'
বনের পাখি বলে, 'না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।'

শাহাজাদপুর
১৯ আষাঢ় ১২৯৯

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে, সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।
কেবল বুড়া রাজা প্রতাপরায় কাঠের মতো বসি আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভালো না লাগে তার কাছে।
বালকবেলা হতে তাহারি গীতে দিল সে এতকাল যাপি—
বাদলদিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দু নয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পুরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভুপালি মূলতানি সুরে॥

ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসবরাতি।
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস, জ্বলেছে শত শত বাতি।

বসেছে নব বর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর—
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপরায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথা নাড়া—
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া॥

থামিল গান যবে ক্ষণেক-তরে বিরাম মাগে কাশীনাথ।
বরজলাল-পানে প্রতাপরায় হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ কহিল, 'ওস্তাদ জি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারি বিড়ালের খেলা।
সেকালে গান ছিল, একালে হায় গানের বড়ো অবহেলা।'

বরজলাল বুড়া, শুক্লকেশ, শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি সবে সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপরায় দিতেছে শত উৎসাহ—
'আহাহা, বাহা বাহা' কহিছে কানে, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো।'

সভার লোকে সবে অন্যমনা, কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চলে যায় ঘরে।
'ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান,' ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে, 'গরম আজি অতিশয়।'

করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ—
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী—
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজ সুখে
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ দু দিকে ধায় দুইজনে
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কী করিয়া।
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে, লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায়, পড়ে না মনে, শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান— আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি,
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা হা করি।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি—
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রুমুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার 'পরে রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপরায় কর বুলায় তার দেহে—
'আইস, হেথা হতে আমরা যাই' কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, 'প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।

জগতে আমাদের বিজন সভা— কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে ;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।'

বোট। শিলাইদহ
২৪ আষাঢ় [১২৯৯]

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর
শরতের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্নবাতাসে। স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনি জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে। যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন। পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিস-পত্র দড়াদড়ি লয়ে—
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে, ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার—
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার

একদণ্ড-তরে। বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড!
এত ঘট, এত পট, হাঁড়ি সরা ভাণ্ড,
বোতল বিছানা বাক্স, রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে! কিছু এর রেখে যাই,
কিছু লই সাথে।'

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনোজন। 'কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে।
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি, কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল,
আমসত্ত আমচুর, সেরদুই দুধ,
এই-সব শিশি কৌটা ওষুধ-বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে—
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।'
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে
'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল-অশ্রুজল করিল গোপন॥

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন

কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান-সমাপন ;
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে— আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে। এত বেলা হয়ে যায়,
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
'মা গো আসি' সে কহিল বিষণ্ণনয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল 'যেতে আমি দিব না তোমায়'।
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল॥

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধাভরে
'যেতে আমি দিব না তোমায়'! চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্তক্ষুদ্রদেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুক-ভরা স্নেহ!

ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে। শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার, টেনে নিয়ে গেল মোরে;
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলি এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর

ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে, 'যেতে নাহি দিব।' তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব।'
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব—
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'। নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়; তবু তো রে

শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুন্ন প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
'যেতে নাহি দিব'। ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যতবার পরাজয়
ততবার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।
আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে, কিছু আছে আর!'
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব' তখনি দেখিতে পায়,
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা-অঙ্গীকার
চির-অধিকারলিপি।' তাই স্ফীতবুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, 'মৃত্যু, তুমি নাই।'— হেন গর্বকথা।
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই

অনন্ত সংসার, বিষণ্ণনয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্প সম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদকুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া॥

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা, অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে। বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লানমুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ, মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৪ কার্তিক ১২৯৯

মানসসুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে,
আজন্মসাধনধন সুন্দরী আমার,
কবিতা কল্পনালতা। শুধু একবার
কাছে বোসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে, শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণমদিরা—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি
এই মধুরতা দিক সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখদৈন্য-অতৃপ্তির 'পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসুন্দরী,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও— মৃণালপরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।

অর্ধেক অঞ্চল পাতি বসাও যতনে
পার্শ্বে তব। সুমধুর প্রিয়সম্বোধনে
ডাকো মোরে, বলো প্রিয়, বলো প্রিয়তম!
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সংগোপনে বলে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে— ভক্তভৃঙ্গ-তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক হাসিস্তরে-স্তরে
সরসসুন্দর। নবস্ফুটপুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো। আনন্দ-আভায়
বড়ো বড়ো দুটি চক্ষু পল্লবপ্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে। যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিয়ো নীরবে অর্ধ-নিমীলিত আঁখি।
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো— অর্ধেক রজনী ধরি
কত-না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান, যদি মুগ্ধপ্রাণে

নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই রব প্রিয়া।
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে। অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো। সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে। যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি
অপার তিমিরে। আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি ;
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জনে। বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি ,
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি
বক্ষ দুরুদুরু ; দুই প্রাণে আছে ফুটি
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালোবাসা॥

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্যবিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,

বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুইজনে
আধো-চেনাশোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
নবীন-বালিকা-মূর্তি— শুভ্রবস্ত্র পরি
উষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি,
বিকচ কুসুমসম ফুল্লমুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে— নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশবকর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হতে ; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্যভবনে ,
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা বলে
ভুলাতে আমারে— স্বপ্নসম চমৎকার,
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয় , দুটি কপোলের 'পরে
খেলিত অলক ; দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক নির্মলনির্ঝরস্রোতে
চূর্ণরশ্মি-সম। দোঁহে দোঁহা ভালো ক'রে
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধুলা ছুটাছুটি দুজনে সতত,
কথাবার্তা— বেশবাস বিথান-বিতত ॥

তার পরে একদিন, কী জানি সে কবে,
জীবনের বনে যৌবনবসন্তে যবে
প্রথম মলয়বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে
চমকিয়া হেরিলাম— খেলাক্ষেত্র হতে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছে অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মতো। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া! পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি! ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষন নবপুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে!
সুন্দর শাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্লপথে
লজ্জামুকুলিতমুখে রক্তিম-অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তরগৃহে— যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিকো সয়
এত সুকুমার! ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসি অশ্রু! সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বরসম; হাসিখানি স্থির

অশ্রুশিশিরেতে ধৌত ; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো ; প্রীতি স্নেহ
গভীর সংগীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণবীণাতন্ত্রী হতে রণিয়া রণিয়া
অনন্ত বেদনা বহি । সে অবধি, প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে , তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত । কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি ? সংগীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে— কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী গানের পুলকে
বিমুগ্ধকুরঙ্গসম ? এই-যে বেদনা
এর কোনো ভাষা আছে ? এই-যে বাসনা
এর কোনো তৃপ্তি আছে ? এই-যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চিরদিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ? সৌন্দর্যপাথারে
যে বেদনাবায়ুভরে ছুটে মনোতরী
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ।
অভয়-আশ্বাস-ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই । বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে— আছে এক মহা-উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ ॥

হাসিতেছ ধীরে ।

চাহি মোর মুখে ওগো রহস্যমধুরা !
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর ! কী কথা বুঝাতে চাও !
কিছু ব'লে কাজ নাই— শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহো গো সবলে
আমার আমারে। নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তররহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া !
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত ;
সংগীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি থরথর করি।
নাইবা বুঝিনু কিছু, নাইবা বলিনু,
নাইবা গাঁথিনু গান, নাইবা চলিনু
ছন্দোবদ্ধ পথে সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে ! শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সংগীতভরে ; নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায় ,
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গ-পানে ; বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া,
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া ।

মানসীরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে

জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী ? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমারাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন ।
শরৎ-প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা ভুলে গিয়ে শেষে
তরুতলে ফেলে দিয়ে আলুলিতকেশে
গভীর-অরণ্য-ছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাকো । ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালবেলায়
বসন বয়ন করো বকুলতলায় ।
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবরতীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মূলতান ।
কখন অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি দাও হৃদয় বিকল ;
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি ; অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে, উপহাসি
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে ।

কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে
স্খলিতবসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলি যায়।— জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মতো বহুক্ষণ কাঁদি স্নেহ-আলোকের
তরে— ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা—
তখন, করুণাময়ী, দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া ; অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও, চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে,
নয়ন চুম্বন করো, স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও, না কহিয়া বাণী,
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া, কখন্ আবার
চলে যাও নিঃশব্দচরণে।

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

নদী হতে, লতা হতে, আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া—
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে ? কী নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি ? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে ? কবরী কেমনে
বাঁধিবে নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ?
কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্র গ্রীবা-'পরে
শিরীষকুসুমসম সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমন ? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘনমেঘভারে
দেখা দেয়, নবনীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে ! কী সঘন পল্লবের ছায়,
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী ! অধর কী সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব ! লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি
অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি
নিঃসহ যৌবনে ।

জানি, আমি জানি সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্মপথে, দাঁড়াব থমকি—
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা । জানি, মনে হবে মম,

চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারা-সম
চিরপরিচয়-ভরা ওই কালো চোখ।
আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে? আমাদের দুইজনে
হবে কি মিলন? দুটি বাহু দিয়ে বালা,
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে? কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে তোমারে, হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে? পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার। বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে; জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল; প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি; গৃহ মাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গলজ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি—
কল্পনার ছল! কার এত দিব্য জ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ,
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি? মিলনে আছিলে বাঁধা

শুধু এক ঠাঁই ; বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে—
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারি ধার।
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।
তবু কোন্ মায়াডোরে চিরসোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়,
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে স্জনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি—
কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি॥

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে।
পদ্মার সুদূর পারে, পশ্চিম আকাশে
কখন্ যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা
মিলাইয়া গেছে। সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে ; শেষ ঘট পূর্ণ ক'রে
কখন্ বালিকাবধূ চলে গেছে ঘরে।
হেরি কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, একাদশী তিথি,
দীর্ঘপথ, শূন্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী।
কখন্ গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠ-পারে কৃষিপল্লী হতে ; নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটিরে

কখন্ জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যাদীপখানি,
কখন্ নিভিয়া গেছে কিছুই না জানি ॥

কী কথা বলিতেছিনু কী জানি, প্রেয়সী,
অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি
স্বপ্নমুগ্ধমত। কেহ শুনেছিলে সে কি—
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে— কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার! সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার
উদ্‌বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিস্বনে।

এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণকান্তি,
বক্ষে মোরে লহো টানি, শোয়াও যতনে
মরণসুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতিশয়নে।

বোট। শিলাইদহ
৪ পৌষ ১২৯৯

দুর্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে?
প্রশান্তবিষাদভরে দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থিরনতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করি নি গোপন।
যাহা আছে সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।

দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না ?।

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার ॥

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো, উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল—
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে ॥

এ যে, সখী, সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল কোথা কূল, দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্যনিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী,
এ তবু তোমার রাজধানী ॥

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে ?
গভীর হৃদয়-মাঝে নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে,
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন ॥

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।

মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়বারতা,
বলিতে হত না কোনো কথা।

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল দুই চক্ষে ছলছল,
বিষণ্ণ অধর, ম্লানমুখ—
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হত কথা।

এ যে, সখী, হৃদয়ের প্রেম—
সুখদুঃখবেদনার আদি অন্ত নাহি যার,
চিরদৈন্য, চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে।
চিরকাল চোখে চোখে নূতন-নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।
বুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কখন্।

পদ্মায়
রাজশাহীর পথে
১১ চৈত্র ১২৯৯

ঝুলন

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারি ধার—

ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা ;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা ॥

ওগো, পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল !
দে দোল্ দোল্ ।
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল ।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল ।
দে দোল্ দোল্ ॥

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার বসিয়া আছে
বুকের কাছে ।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে হৃদয় নাচে ;
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে ॥

হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তারে যতনভরে
শয়ন-'পরে ।
ব্যথা পাছে লাগে— দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন কুসুমথরে ;
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে
যতনভরে ॥

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি নয়নপাতে
স্নেহের সাথে ।

শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয়নাম মৃদুমধুভাষে,
গুঞ্জরতান করিয়াছি গান জ্যোৎস্নারাতে ;
যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে ॥

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে ;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশবশে ॥

ঢালি মধুরে মধুর বধুরে আমার হারাই বুঝি,
পাই নে খুঁজি।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম হয়েছে পুঁজি ;
অতল স্বপ্নসাগরে ডুবিয়া মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি ॥

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা ;
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা ॥

দে দোল্ দোল্!
আয়রে ঝঞ্ঝা, পরাণ-বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি' লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-
বসন খোল্!
দে দোল্ দোল্!
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি' ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল,
দে দোল্ দোল্!
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগল!
দে দোল্ দোল্!
দে দোল্ দোল্!

১৫ চৈত্র। ১২৯৯
রামপুর বোয়ালিয়া।

দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার, ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয়রোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কী কল্লোল!
উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী— মত্তবোল।
দে দোল্ দোল্॥

আয় রে ঝঞ্ঝা, পরানবধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্॥

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ দুটো পাগল।
দে দোল্ দোল্॥

রামপুর বোয়ালিয়া
১৫ চৈত্র ১২৯৯

সমুদ্রের প্রতি

পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি। তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি! ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরে ধীরে পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও, আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে,
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট
আদি-অন্ত স্নেহরাশি— আদি অন্ত তাহার কোথা রে,
কোথা তার তল, কোথা কূল! বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগম্ভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি! কখনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীতস্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি

নির্দয় আবেগে। ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি,
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্ধ্বস্বরে চীৎকারি উঠিতে চাহে কাঁদি ;
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তারে বাঁধি
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি-মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা-অপরাধী-প্রায়
পড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল। ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমা-পানে ; সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে
চলে যায় তিমিরমন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার— বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ঐ ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের— অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি '

তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহা-রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি— নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি-নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়নশিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্নপ্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি— হৃদয়ে আমার
যুগান্তরস্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার॥

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাতব্যথা-ভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্যসুদূর-তরে
উঠিছে মর্মরস্বর। মানবহৃদয়সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে; মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে;
সহস্র ব্যাঘাত-মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে—
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে

চেয়ে আছি তোমা-পানে ; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো ॥

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা ? জান কি ?— তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ - ও পাশ ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস ;
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা—
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকাজালে । অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো ; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা
বলো তারে 'শান্তি । শান্তি !'— বলো তারে 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা' ॥

রামপুর বোয়ালিয়া
১৭ চৈত্র ১২৯৯

হৃদয়যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে ।
তলতল্ ছলছল্ কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে ।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে ।

ওই-যে শবদ চিনি— নূপুর-রিনিকি-ঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে॥

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে—
হেথা শ্যাম দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জতৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে॥

যদি গাহন করিতে চাও এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগতরঙ্গরাশি অঙ্গখানি নিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে
কুলুকুলু কলভাষে কত-কী ছলে!
যদি গাহন করিতে চাও এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে॥

যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর—
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে॥

১২ আষাঢ় ১৩০০

ব্যর্থ যৌবন

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে।
এ বেশভূষণ লহো সখী, লহো—
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল বিরহশয়নে।
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে॥

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি।
বহি বৃথা মনোআশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে!
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে॥

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে।

বনে ফুটেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল বাতাসে।
তরুমর্মর নদীকলতান
কানে লেগেছিল স্বপ্ন-সমান,
দূর হতে আসি পশেছিল গান শ্রবণে।
আজি সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে॥

মনে লেগেছিল হেন, আমারে সে যেন ডেকেছে।
যেন চিরযুগ ধরে মোরে মনে করে রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অনুরাগ,
যৌবননদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-বাঁধনে।
আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে॥

ওগো, ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর?
যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর?
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো
রজনীপ্রভাতে বসে রব কত!
এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে।
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে॥

১৬ আষাঢ় ১৩০০

প্রত্যাখ্যান

অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।
অমন সুধাকরুণ সুরে গেয়ো না॥
সকালবেলা সকল কাজে আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়ো না।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না॥

মনের কথা রেখেছি মনে যতনে।
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়— দুচারি-ফোঁটা-অশ্রু-ময়
একটি শুধু শোণিতরাঙা বেদনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না॥

কাহার আশে দুয়ারে কর হানিছ।
না জানি তুমি কী মোরে মনে মানিছ।
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ, নাহিকো মোর রানীর সাজ
পরিয়া আছি জীর্ণচীর বাসনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না॥

কী ধন তুমি এনেছ ভরি দু হাতে?
অমন করি যেয়ো না ফেলি ধুলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই কী আছে হেন, কোথায় পাই—
জনমতরে বিকাতে হবে আপনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না॥

ভেবেছি মনে, ঘরের কোণে রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা— বলিতে চাহি, নাহিকো ভাষা—
রয়েছে সাধ, না জানি তার সাধনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না॥

যে সুর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে!
গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান উছলি উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ রোদনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না॥

এসেছ তুমি গলায় মালা ধরিয়া,
নবীনবেশ শোভনভূষা পরিয়া।
হেথায় কোথা কনকথালা, কোথায় ফুল, কোথায় মালা—
বাসরসেবা করিবে কেবা রচনা!
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।

ভুলিয়া পথ এসেছ, সখা, এ ঘরে—
অন্ধকারে মালা-বদল কে করে!
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবননিশি-যাপনা।
অমন দীননয়নে আর চেয়ো না।

২৭ আষাঢ় ১৩০০

লজ্জা

আমার হৃদয় প্রাণ সকলই করেছি দান,
কেবল শরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া;
চাহিয়া আঁখির কোণে তুমি হাস মনে মনে,
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া।

দক্ষিণপবনভরে অঞ্চল উড়িয়া পড়ে
কখন্ যে নাহি পারি লখিতে;
পুলকব্যাকুল হিয়া অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে।

বদ্ধ গৃহে করি বাস রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি গিয়া বাতায়নে সুখসন্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া।

পূর্ণচন্দ্রকররাশি মূর্ছিত পড়ে আসি
এই নবযৌবনের মুকুলে;
অঙ্গ মোর ভালোবেসে ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে।

মুখে বক্ষে কেশপাশে ফিরে বায়ু খেলা-আশে,
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে,
হেনকালে তুমি এলে মনে হয় স্বপ্ন ব'লে—
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে।

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে, ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ শরম দাও মোরে রাখিতে—
সকলের অবশেষে এইটুকু লাজলেশ
আপনারে আধখানি ঢাকিতে।

ছলছল-দু'নয়ান করিয়ো না অভিমান—
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারি নে যেন সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি।

কেন যে তোমার কাছে একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে—
এ নহে গো অবিশ্বাস, নহে, সখা, পরিহাস—
নহে নহে ছলনার খেলা এ।

বসন্তনিশীথে, বঁধু, লহো গন্ধ, লহো মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো—
দিয়ো দোল আশে-পাশে, কোয়ো কথা মৃদু ভাষে,
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো ॥

সেটুকুতে ভর করি এমন মাধুরী ধরি
তোমা-পানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহনভঙ্গে আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া—

এমন সকল বেলা পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্তকুসুম-মেলা দুধারি।
শুন, বঁধু, শুন তবে সকলই তোমার হবে—
কেবল শরম থাক্ আমারি।

২৮ আষাঢ় ১৩০০

পুরস্কার

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী,
'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি!
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।

অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধ'রে এ কী ছেলেখেলা
ভারতীরে ছাড়ি ধরো এইবেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো, ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখ নি
কিসে কড়ি আসে দুটো!'
দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া
কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি করপুট,
'ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,
ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে
এ কথা শুনিবে কেবা!
আমার কপালে বিপরীত ফল
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল
এত করি তাঁর সেবা।
তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্তে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক-তিল
অমনি সর্বনাশ।'
মনে মনে হাসি মুখ করি ভার
কহে কবিজায়া, 'পারি নেকো আর,
ঘরসংসার গেল ছারেখার,
সব তাতে পরিহাস!'

এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি
শিঞ্জিত করি কাঁকন-দুখানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি
রোষছলে যায় চলি।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমানবেগে অধীর গমন
উচাটন কবি কহিল, 'অমন
যেয়ো না হৃদয় দলি।
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু পায়,
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়—
বুদ্ধি জোগাও তুমি।
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমার মুরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই—
সমস্ত মরুভূমি।'
'হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়'
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়,
'যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়
আমার কপালগুণে।
কথার কখনো ঘটে নি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব,
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিন ক্ষণ দেখো পাঁজি খুলি,
সঙ্গে করিয়া লহো পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি
চলো রাজসভা-মাঝে।

আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মানুষ হইয়া গেল কত লোক,
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
লাগিবে কিসের কাজে!'
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ,
ভাবিল— বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানি নে রাজা মহারাজ,
কপালে কী জানি আছে!
মুখে হেসে বলে, 'এই বৈ নয়!
আমি বলি, আরো কী করিতে হয়!
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
বিধবা হইবে পাছে।
যেতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ,
ত্বরা করে তবে নিয়ে এসো সাজ—
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ূর, কনকহার।
বলে দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,
কিঙ্করগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন করো তার।'
ব্রাহ্মণী কহে, 'মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই, কী চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে তার
না দেখি আবশ্যক।
নানা বেশভূষা হীরা রুপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা,
সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক।'

এতেক বলিয়া ত্বরিতচরণ
আনে বেশবাস নানান-ধরণ,
কবি ভাবে মুখ করি বিবরণ—
আজিকে গতিক মন্দ।
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কষিয়া
পরাইল কটিবন্ধ।
উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়,
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন
কবি বসি থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সেও আজি হার মানে।
এইমতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক;
হাসি উঠি কহে ধরিয়া চিবুক,
'আ মরি, সেজেছ কিবা!'
ধরিল সমুখে আরশি আনিয়া;
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
'পুরনারীদের পরান হানিয়া
ফিরিয়া আসিবে আজি।

তখন দাসীরে ভুলো না গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
রতনভূষণরাজি।'
কোলের উপরে বসি বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি, 'কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণতলে।'
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি,
উষ্ণীষ-পরা মস্তক তুলি
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি,
দ্রুত রাজগৃহে চলে।
কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে
উঁকি মারি চায়, মনে মনে হাসে—
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুলপুলকে—
রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে,
এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে।

এ দিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে,
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে।
রাজসভাসদ্‌ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা,
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা—
হেথা কি আসিতে আছে!
হেসে ভালোবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারীমহাশয়
সবে গম্ভীরমুখ।
মানুষ কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মুরতি
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি—
দমি যায় তার বুক।
বসি মহারাজ মহেন্দ্ররায়
মহোচ্চ গিরিশিখরের প্রায়
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল-অটল-ছবি।
কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া
শত শত দেশ সরস করিয়া,
সে মহামহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
বিচার সমাধা হল যবে, শেষে
ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্রী-আদেশে
জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।

অতি সাধুমত আকার প্রকার,
এক-তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষ-শিকার
নাহি জানে কোনো নর।
ব্রত নানামত সতত পালয়ে,
এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে
ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে
বিতরিছে যাকে তাকে।
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে—
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে
সন্ধান তার রাখে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণবরূপে
যখন সে আসি প্রণমিল ভূপে
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে
কী করিল নিবেদন।
অমনি আদেশ হইল রাজার,
'দেহো এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার।'
'সাধু সাধু' কহে সভার মাঝার
যত সভাসদ্‌জন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে,—
'এ যে দান ইহা যোগ্যপাত্রে,
দেশের আবাল-বনিতা-মাত্রে
ইথে না মানিবে দ্বেষ।'
সাধু নুয়ে পড়ে নম্রতাভরে,
দেখি সভাজন 'আহা আহা' করে,
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে
ঈষৎ হাস্যলেশ।

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে।
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম,
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম,
প্রখরমূর্তি অগ্নিশর্ম—
ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ না ক'রে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে,
মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি থাকে মাথা করি নিচু;
রাজা বলে, 'এঁরে দক্ষিণা কিছু
দাও দক্ষিণ হাতে।'
তার পরে এল গনৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
বাজায়ে সে গেল চলি।
আসে এক বুড়া গণ্যমান্য
করপুটে লয়ে দূর্বাধান্য,
রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্য
ভরিয়া দিলেন থলি।
আসে নট ভাট রাজপুরোহিত—
কেহ একা কেহ শিষ্য-সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত
কারো বা হরিৎবর্ণ।

আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য—
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ—
যার যথামত পায় বরাদ্দ ;
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে
বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ, 'হোথা বসিয়া কে ওই
এসো তো, মন্ত্রী, সন্ধান লই।'
কবি কহি উঠে, 'আমি কেহ নই,
আমি শুধু এক কবি।'
রাজা কহে, 'বটে! এসো এসো তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।'
বসাইল কাছে মহাগৌরবে
ধরি তার কর দুটি।
মন্ত্রী ভাবিল, যাই এই বেলা,
এখন তো শুরু হবে ছেলেখেলা—
কহে, 'মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।'
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ-ইঙ্গিতে মহাভ্রস্ত
বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল—
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী,
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ-উপাধি
বন্যার যেন জল।

চলি গেল যবে সভ্যসুজন
মুখোমুখি করি বসিলা দুজন ;
রাজা বলে, 'এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ করো কবি।'
কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণীবন্দনা করে নত মুখে,
'প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমলমানসসরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিতমঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী—
সুরের খাদ্যে জানো তো মা, বাণী,
নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে সে কথা ভাবি না,
মা গো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী
অমৃত-উৎসধারা।

যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিনমর্ত্ত-মাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা।
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হতে।
যে রাগিণী চিরজন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া—
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়—
বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ—
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী—
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসারকোলাহল।

সে জন পাগল, পরান বিকল—
ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল,
ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমলকমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা-আনন্দ—
অপূর্ব গীত, অলোক ছন্দ
শুনিছে নিত্য নব।
বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী—
বারেকের তরে ভুলাও, জননী,
কে বড়ো কে ছোটো, কে দীন কে ধনী,
কেবা আগে কেবা পিছে—
কার জয় হল কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি কার হল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়,
কে উপরে কেবা নীচে।
গাঁথা হয়ে যাক এক গীতরবে
ছোটো জগতের ছোটোবড়ো সবে,
সুখে প'ড়ে রবে পদপল্লবে
যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি,
কুন্দবরন-সুন্দর-হাসি
বীণা হাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা
তব সংগীতস্রোতে।

দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল
নাচে দশ দিক হতে।'
এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি,
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে
সেই একদিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকলবসনে
চলিলা বনের পথে—
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লানছায়াসম বিষাদবিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়রথে।
রাজপুরী-মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে-সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে!
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারি ধার—
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।

আর-একদিন, ভেবে দেখো মনে,
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটিরভবনে
দেখিলা জানকী নাহি—
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার-আননে
রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের—
এত বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভা-মাঝে
বিদায়বিনয়ে নমি রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।
সে-সকল দিন সেও চলে যায়,
সে অসহ শোক— চিহ্ন কোথায়—
যায় নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধরেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্লশ্যামলেখা।
শুধু সে দিনের একখানি সুর
চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে।

সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।'
তার পরে কবি কহিল সে কথা
কুরুপাণ্ডবসমরবারতা—
'গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্ব দেশ;
দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,
ঘর্ষণে জ্বলে হুতাশনরাশি,
মহাদাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি
অরণ্যপরিবেশ।
এক গিরি হতে দুই-স্রোত-পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা
সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে,
দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্রশোণিত—
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয়বন্যাগানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি নির্মূল
ছুটিল রক্তধারা—
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি,
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি
নিবায়ে সূর্যতারা।

সমরবন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতলশয়ান
পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই।
ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে
বসিয়া শোণিতপঙ্কশয়নে,
চাহি ধরা-পানে আনতবয়নে
মুখেতে বচন নাই।
বহু দিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহা-নরমেধ
বিদ্বেষহুতাশনে।
সকল কামনা করিয়া পূর্ণ
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ
পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণসিংহাসনে।
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার—
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্ম্মবিদার রব।
'জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়'
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়—
পরিহাস ব'লে আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব।
কালি যে ভারত সারা দিন ধরি
অট্ট গরজে অম্বর ভরি
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি কুলভয়লাজে,

পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসীবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া
বসি একাকিনী শোকার্তহিয়া
শূন্যশ্মশানমাঝে।
কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার।
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিকো আর।
তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমরসাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে।
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান্‌,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে।
হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক্‌-দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি।
এমনি বরষা আজিকার মতো
কতদিন কত হয়ে গেছে গত,
নবমেঘভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুরাশি।

যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখিরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যেজন ভালো সে বেসেছে
আজি আমাদেরই মতো ;
তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান
দু হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান—
দেশে দেশে তার নাহি পরিমাণ
ভেসে ভেসে যায় কত।
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে,
সমস্ত প্রাণে কেন-যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল !
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহি নে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক' দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন-মনে—
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসারধূলিজালে।
অতিদুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝরসংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোটো এই বাঁশরিতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর-অর্থ-ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে
শিশিরের মতো রবে।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে—
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর।
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দুচারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী—
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।
কত সুখ ছিল হয়ে গেছে দুখ,
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালোবাসা।
শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তর-মাঝে—
আয় রে বৎস, আয়,

ফেলে রেখে আয় হাসি ক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন
চিরবসন্ত-বায়।
সেই ভালো মা গো, যাক যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায় —
কমলগন্ধ কোমল দু পায়
বার বার নমোনম।'
এত বলি কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধনয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান
বীণাঝংকার-সম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল্,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল—
দু বাহু বাড়ায়ে, পরান উতল,
কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা 'ধন্য, কবি গো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য—
চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা-কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।'
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দু নয়ন কবি তাঁরে বলে,
'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।'

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে,
কেহ শিবিকায় কেহ ধায় রথে,
নানা দিকে লোক যায় নানামতে
কাজের অন্বেষণে।
কবি নিজমনে ফিরিছে লুব্ধ,
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃতদুগ্ধ
দোহন করিছে মনে।
কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ
সন্ধ্যার মতো পরি রাঙা বাস
বসি একাকিনী বাতায়ন-পাশ—
সুখহাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারি দিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে—
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে।
অঙ্গুলি তার চলিছে যেমন
কত কী-যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি
বাহুখানি নাড়ি মৃদু ঝিনিঝিনি
বাজাইয়া দিল করকিঙ্কিণী,
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে ঘেরি।
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি;
অতি সত্বর সম্মুখে আসি
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি,
'দেখো কী এনেছি বালা!

নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।'
এত বলি মালা শির হতে খুলি
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি,
কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি—
ফিরায়ে রহিল মুখ।
মিছে ছল করি মুখে করে রাগ—
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ,
হৃদয়ে উথলে সুখ।
কবি ভাবে বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন—
বসি থাকে মুখ করি বিষণ্ণ
শূন্যে নয়ন মেলি।
কবির ললনা আধখানি বেঁকে
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে—
পতির মুখের ভাবখানা দেখে
মুখের বসন ফেলি
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া
শতবার করি আপনি-সাধিয়া
চুম্বিল তার মুখে।

বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়,
মালাখানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে
বাঁধা প'ল এক মাল্যবাঁধনে
লক্ষ্মীসরস্বতী॥

শাহাজাদপুর
১৩ শ্রাবণ ১৩০০

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার— হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে,
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে
পুরবে পশ্চিমে; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ়জীবনরসে; যাই পরশিয়া

স্বর্ণশীর্ষে-আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে। নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্-দিগন্তরে ; শুভ্র-উত্তরীয়-প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদয়ের চারি ধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়— ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া ! বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে।

স্থদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি স্থচি বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা-'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন নিঃশব্দ, নির্দয় ।
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ।— চারি দিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ডমেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি ; হিমরেখা
নীলগিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি, যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি-সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে ।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে— যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্র-পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব-আভরণ-হীন ;
যেথা দীর্ঘ রাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন ; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো ।

নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে।— সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম; তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে
আঁকিয়া-বাঁকিয়া। ইচ্ছা করে, সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে-সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধু-পানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি;
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে,
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক-সনে
দেশে দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দম স্বাধীন; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী-মাঝে বৌদ্ধমঠে

করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত —সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ ; নাই চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাই ঘর পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপজর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়,
বর্তমানতরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য ক'রে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালোবাসি ;
কতবার ইচ্ছা করে, সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপাল-ভরে
লঘুতরীসম।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে

বিদ্যুতের বেগে ; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ ।
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে ।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে । ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ,
প্রভাতরৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ'পরে সারাদিন দুলি
আনন্দদোলায় ; রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দচরণে বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশু-পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ-অঞ্চল-প্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে ।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি,
সব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্তহিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনোদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা-
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা

মনে যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহো
মোরে আরবার। দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে, যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে,
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব-মাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে, গুঞ্জরিছে গান

শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানী যত ; আনন্দের রস
কত রূপে হতেছে বর্ষণ, দিক্ দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার—
প্রভাত-আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে— যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দু নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে! প্রাণস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকা-সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন ; তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে

তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্তবাসী
নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ-পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে
কতশত নরনারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ? আসিব না নেমে—
তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তাদের সর্বাঙ্গ-মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর-রূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি—
এই-সব তরুলতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে-অন্তরে-গাঁথা জীবনসমাজ ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ

তোমার আত্মীয়-মাঝে ; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা -রূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশ-মাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে। এখনো মিটে নি আশা,
এখনো তোমার স্তন -অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন ;
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ।
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহো গো মোরে,
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে
আমারে করিয়া লহো তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও— রাখিয়ো না দূরে।

২৬ কার্তিক ১৩০০

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ।
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু, মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে ।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে ।
কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে ?।

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায় অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল্‌-আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না ব'লে ।

হুহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস ।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছ্বাস ।
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন ।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ—

তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার বিলাস হেন ॥

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি 'কে যাবে সাথে'—
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন—
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না ব'লে ॥

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ, কখনো রবি—
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো শান্তছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়—
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে ॥

আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি।

বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
'কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি॥

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

বিদায়-অভিশাপ

কচ। দেহো আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
সমাপ্ত আমার। আশীর্বাদ করো মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখরশিরে সূর্যের মতন
অক্ষয়কিরণ।

দেবযানী। মনোরথ পুরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি, আর-কিছু নাহি কি কামনা,
ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই! তবু আরবার দেখো চাহি,
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোনো বাঞ্ছা থাকে— কুশের অঙ্কুর-সম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোনো ঠাঁই
মোর মাঝে কোনো দৈন্য কোনো শূন্য নাই
সুলক্ষণে!

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ-মাঝে।
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া। স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষন
সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দারমঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী
দিবে হুলুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহু ক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে। নাহি ছিল কেহ
স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাসবেদনা। অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটিরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই ব'সে স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার! বড়ো আশা করি মনে,
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে।

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।

দেবযানী। হাসি? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীট-সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম-মাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে

মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে; হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কী হইবে মিথ্যা কাল নাশি,
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।—
যেতেছ চলিয়া?
সকলি সমাপ্ত হল দু কথা বলিয়া?
দশ শত বর্ষ-পরে এই কি বিদায়!

কচ। দেবযানী, কী আমার অপরাধ!

দেবযানী। হায়,
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভছায়া, পল্লবমর্মর—
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন— তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হেরো আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝ'রে পড়ে—
তুমি শুধু চলে যাবে সহাস্য-অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম?

কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর 'পরে
নাহি মোর অনাদর— চিরপ্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই
গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খর তাপে; ক্লান্ত তব কায়ে

অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি
ঝর্ঝরপল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে— যেয়ো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বোসো শেষবার,
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহছায়ার,
দুই দণ্ড থেকে যাও, সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোনো ক্ষতি।

কচ। অভিনব
ব'লে যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এই-সব চিরপরিচিত বন্ধুগণে;
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,
অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার।
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কতদিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জন
তৃণাসনে পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে
করিবেক অধ্যয়ন, প্রাতঃস্নান-পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে, রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা— ওগো, তারি মাঝে
এ পুরানো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে।

দেবযানী। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে;
স্বর্গসুধা পান ক'রে সে পুণ্যগাভীরে
ভুলো না গরবে।

কচ। সুধা হতে সুধাময়
দুগ্ধ তার; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা শ্রান্তি
তারে করিয়াছি সেবা; গহনকাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনীতীরে তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি নিম্নতট-'পরে
অপর্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল
আলস্যমন্থরতনু লভি তরুতল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারাবেলা, মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি, গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।

দেবযানী। আর, মনে রেখো আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।

কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী, কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্যশুভব্রতা।

দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধ'রে—

হায় রে দুরাশা !

কচ। চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

দেবযানী। আছে মনে—
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ-অরুণ-প্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধদীপ্তি-ঢালা,
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

কচ। তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে নবশুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নাত মূর্তিমতী উষা, হাতে সাজি,
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি,
তোমারে সাজে না শ্রম, দেহো অনুমতি
ফুল তুলে দিব দেবী !

দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেইক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে, আসিয়াছি তব দ্বারে,
তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে—
আমি বৃহস্পতিসুত।

কচ। শঙ্কা ছিল মনে,
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে।
হাসিয়া কহিনু, পিতা, ভিক্ষা এক আছে

চরণে তোমার। স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাষে
কহিলেন, কিছু নাহি অদেয় তোমারে।
কহিলাম, বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহো তুমি তাঁরে
এ মিনতি।— সে আজিকে হল কত কাল!
তবু মনে হয়, যেন সেদিন সকাল।

কচ। ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ; তুমি, দেবী, দয়া ক'রে
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ— সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোনো দুঃখ নাই।
উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই—
নাহি চাই দানপ্রতিদান। সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোনোদিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোনো সন্ধ্যাবেলা বেণুমতীতীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে,
ফুলের সৌরভ -সম হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত করে দিয়ে থাকে সায়াহ্ন-আকাশ
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো। দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা।
যদি, সখা, হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ, পরিধান
করে থাকে কোনোদিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন-অন্তর

তৃপ্তচোখে 'আজি এরে দেখায় সুন্দর',
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে। কতদিন এই বনে
দিক্-দিগন্তরে আষাঢ়ের নীলজটা
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্মহীন দিনে সঘনকল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয়; এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাসহিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সংগীতমুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দপ্লাবন; ভেবে দেখো একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে;
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চিরচিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর!

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী! বহে যাহা মর্ম-মাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব!

দেবযানী। জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে

চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে ; তাই আজি হেন
স্পর্ধা রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়ো নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া-সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত। ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার।

কচ। নহে, নহে দেবযানী।

দেবযানী। নহে ? মিথ্যা প্রবঞ্চনা ! দেখি নাই আমি
মন তব ! জান না কি প্রেম অন্তর্যামী ?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায় ? কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমন,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সে কি আমি দেখি নাই !
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরই লাগি করেছি সাধনা ?

দেবযানী। কেন নহে ?
বিদ্যারই লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে

এ জগতে ? করে নি কি রমণীর লাগি
কোনো নর মহাতপ ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত ? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ ! সহস্র বৎসর ধ'রে
সাধনা করেছ তুমি কী ধনের তরে
আপনি জানো না তাহা ! বিদ্যা এক ধারে,
আমি এক ধারে— কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে ; তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সংগোপনে। আজ মোরা দোঁহে এক দিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহো, সখা, চিনে
যারে চাও। বলো যদি সরল সাহসে
'বিদ্যায় নাহিকো সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানি, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী—
তোমারেই করিনু বরণ', নাহি ক্ষতি,
নাহি কোনো লজ্জা তাহে। রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরই, সখা, সাধনার ধন।

কচ। দেবসন্নিধানে, শুভে, করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনীবিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব ; এসেছিনু তাই
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন। কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

দেবযানী। ধিক্‌ মিথ্যাভাষী !
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে ! গুরুগৃহে আসি

শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে
অহরহ ? উদাসীন আর সবা-'পরে ?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মালাখানি
সহাস্য প্রফুল্লমুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে ? এই কি কঠোর ব্রত ?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মতো ?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি—
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্লশিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা ? অপরাহ্নকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে ;
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি
দিতে জল তুলে ? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে ?
স্বর্গ হতে যে সংগীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো ? আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে ? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে— কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা

দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি
মনের সন্তোষে !

কচ। হা অভিমানিনী নারী,
সত্য শুনে কী হইবে সুখ ? ধর্ম জানে,
প্রতারণা করি নাই ; অকপট-প্রাণে
আনন্দ-অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ,
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে
কব না সে কথা। বলো কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কি না আজ
সে তর্কে কী ফল ! আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূরবনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধমৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য-মাঝে— তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব-সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে ; তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষম মোরে দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ !

দেবযানী। ক্ষমা কোথা মনে মোর !
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর
হে ব্রাহ্মণ ! তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্যপুলকে

সর্ব দুঃখশোক করি দূরপরাহত—
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত!
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব! এই বনে
ব'সে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষাহীনা। যে দিকেই ফিরাইব আঁখি—
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর,
বারম্বার করিবে দংশন। ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি নির্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড-দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন ক'রে নিয়ে, মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুইভাগ ক'রে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে! লুটাইল ধূলি-'পরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা! তোমা-'পরে
এই মোর অভিশাপ— যে বিদ্যার তরে
মোরে করো অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে—
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

কালীগ্রাম
২৩ শ্রাবণ [১৩০০]

সুখ

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরলকল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো। গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠমগন
করিছে কৌতুকালাপ ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর ! বসি এক বাঁধা নৌকা-'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া। উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে ; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজ্বালাতন।
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার—
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা। আতপ্ত পবনে

তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি রহি
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর ॥

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা। মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত, বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে বাক্যহীন
শৈশববিশ্বাসে চিররাত্রি চিরদিন।
বিশ্ববীণা হতে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন।
সে সংগীত কী ছন্দে গাঁথিব। কী করিয়া
শুনাইব, কী সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালোবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কী হাসি-আকারে
নয়নে অধরে, কী প্রেমে জীবনে তারে
করিব বিকাশ! সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি
প্রফুল্ল সরস! কঠিন-আগ্রহ-ভরে
ধরি তারে প্রাণপণে— মুঠির ভিতরে
টুটি যায়! হেরি তারে তীব্রগতি ধাই—
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি চলি যাই,
আর তার না পাই উদ্দেশ ॥

চারি দিকে
দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে

এই স্তব্ধ নীলাম্বর, স্থির শান্ত জল—
মনে হল, সুখ অতি সহজ সরল ॥

রামপুর বোয়ালিয়া
১৩ চৈত্র ১২৯৯

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্‌। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট; পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট-মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ। সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি; অমরবীণায়
উঠিয়াছে কী ঝংকার! নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশ বিদেশের
ভাষা, যুগ যুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান॥

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তীসতী

বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদমর্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী,
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশমন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনাসিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারি শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্তব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রুমন্দাকিনী, নিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায় ; বাঁশরির ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথিরে ;— হাত ধ'রে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ

শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব-অর্থ-ভরা ; চিরসুহৃদ্‌সমান
সর্ব চরাচর ॥

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন— সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছকর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কী কারণে। অয়ি মহীয়সী মহারানী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। আজি
এই-যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধা-পানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ? তাহারা কি
পায় দেখিবারে— নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্যবসনে ?
তব স্পর্শ, তব প্রেম, রেখেছি যতনে—
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি সর্ব দেহমন
পূর্ণ করি— রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে ; কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার

সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট্।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৪ মাঘ ১৩০০

এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল! কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়! স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে! ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,

নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার ;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'

কবি, তবে উঠে এসো— যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা— সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী ! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়

রেখো না বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।— কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও?
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল।— যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি!
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে— দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি— তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে— জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়— গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ;

তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি,
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে। তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমালাখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্বদুঃখগ্লানি
সর্ব-অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।

রামপুর বোয়ালিয়া
২৩ ফাল্গুন ১৩০০

মৃত্যুর পরে

আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুল ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত-কিছু ভালোমন্দ যত-কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই!
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।

গুঞ্জরি করুণ তান ধীরে ধীরে করো গান
বসিয়া শিয়রে।
যদি কোথা থাকে লেশ জীবনস্বপ্নের শেষ
তাও যাক মরে।
তুলিয়া অঞ্চলখানি মুখ'পরে দাও টানি,
ঢেকে দাও দেহ—
করুণ মরণ যথা ঢাকিয়াছে সব ব্যথা
সকল সন্দেহ।

বিশ্বের আলোক যত দিগ্বিদিকে অবিরত
যাইতেছে বয়ে,
শুধু ওই আঁখি-'পরে নামে তাহা স্নেহভরে
অন্ধকার হয়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি দিনে উচ্চে উঠে বাজি,
রাত্রে চুপে চুপে
সে শব্দ তাহার 'পরে চুম্বনের মতো পড়ে
নীরবতারূপে।

মিছে আনিয়াছ আজি বসন্তকুসুমরাজি
দিতে উপহার,
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার।
ছিলে যারা রোষভরে বৃথা এতদিন পরে
করিছ মার্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা॥

গিয়েছে কি আছে বসে, জাগিল কি ঘুমালো সে
কে দিবে উত্তর?
পৃথিবীর শ্রান্তি তারে ত্যজিল কি একেবারে—
জীবনের জ্বর?
এখনি কি দুঃখসুখে কর্মপথ-অভিমুখে
চলেছে আবার?
অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার?

বসিয়া আপন দ্বারে ভালো মন্দ বলো তারে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম-মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুঃখে সুখে
আসিবে না ফিরে—
তবে তার কথা থাক্, যে গেছে সে চলে যাক
বিস্মৃতির তীরে।

জানি না কিসের তরে যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,

ভালো মন্দ শেষ করি যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।
দিয়ে যায় যত যাহা রাখ তাহা ফেল তাহা
যা ইচ্ছা তোমার।
সে তো নহে বেচাকেনা, ফিরিবে না, ফেরাবে না
জন্ম-উপহার॥

কেন এই আনাগোনা, কেন মিছে দেখাশোনা
দু দিনের তরে,
কেন বুক-ভরা আশা, কেন এত ভালোবাসা
অন্তরে অন্তরে,
আয়ু যার এতটুক এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে,
অকস্মাৎ এ সংসারে কে বাঁধিয়া দিল তারে
শতলক্ষ কাজে—

হেথায় যে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত,
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি—

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল,

চিরকাল এই-সব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর—
জন্মান্তের নবপ্রাতে সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।

সে হয়তো দেখিয়াছে— প'ড়ে যাহা ছিল পাছে
আজি তাহা আগে,
ছোটো যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন
বড়ো হয়ে জাগে।
যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালী
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়াছে জ্বালি।

কত শিক্ষা পৃথিবীর খ'সে পড়ে জীর্ণচীর
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয় নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতাহুতাশনে।
সকল-অভ্যাস-ছাড়া সর্ব-আবরণ-হারা
সদ্যশিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম।

আপন মনের মতো সংকীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ;
ভুলে যাও কিছুক্ষণ প্রত্যাহের আয়োজন,
সংসারের কাজ।

আজি ক্ষণেকের তরে বসি বাতায়ন-'পরে
বাহিরেতে চাহো ;
অসীম আকাশ হতে বহিয়া আসুক স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ ॥

উঠিছে ঝিল্লির গান, তরুর মর্মরতান,
নদীকলস্বর ;
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের 'পর ।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে
সংগীত উদার ;
সে নিত্য-গানের সনে মিশাইয়া লহো মনে
জীবন তাহার ॥

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া ।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে ;
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে ॥

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন,
তারে লয়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন—
এত আলাপন !

যে বিশ্ব কোলের 'পরে চিরদিবসের তরে
তুলে নিল তারে
তার মুখে শব্দ নাহি— প্রশান্ত সে আছে চাহি
ঢাকি আপনারে।

বৃথা তারে প্রশ্ন করি, বৃথা তার পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে।
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে ফিরে নিতে চাহি মিছে—
সে কি আমাদের?
পলেক বিচ্ছেদে হায় তখনি তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।

চক্ষের আড়ালে তাই কত ভয় সংখ্যা নাই,
সহস্র ভাবনা।
মুহূর্ত মিলন হলে টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে ব'সে ধরি মুঠি, শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি
চাহি চারি ভিতে—
অনন্তের ধনটিরে আপনার বুক চিরে
চাহি লুকাইতে।

হায় রে নির্বোধ নর, কোথা তোর আছে ঘর,
কোথা তোর স্থান!
শুধু তোর ওইটুক অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্ধ্বে ওই দেখ্ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ—

সে যখন এক ধারে লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ ?।

ওই হেরো সীমাহারা গগনেতে গ্রহ তারা-
অসংখ্য জগৎ,
ওরই মাঝে পরিভ্রান্ত হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর-দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন-'পরে
কভু কোনোখানে
আর কি গো দেখা হবে, আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক, ঘুচে যাক সর্ব শোক
সর্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্তজন্মশিখা।
সব তর্ক হোক শেষ— সব রাগ, সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৫ বৈশাখ ১৩০১

সাধনা

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।

তুমি জানো মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা দিবসনিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধার গিয়েছে মিশি।
তবু, ওগো দেবী, নিশিদিন করি পরানপণ
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন—
ব্যর্থ সাধনখানি।
ওগো, ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল সকল ভক্ত-প্রাণী।
তুমি যদি, দেবী, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহসুকোমল—
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল করুণা মানি
সব হতে তবে সার্থক হবে ব্যর্থ সাধনখানি।

দেবী, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস— ছিঁড়িল তার।

স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন—
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
ওগো, ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সংগীতগুলি হৃদয়াসীনা!—
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায় ছিন্নতন্ত্রী বীণা॥

দেবী, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল,
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক,
যত দিন থাকে তত দিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক ধুলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ—
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার-মাঝ বিবিধ সাজে।
যা-কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।
ওগো, বিফল বাসনারাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে হাসিছে হেলার হাসি

তুমি যদি, দেবী, লহ কর পাতি—
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি সুবাসে ভাসি ;
সফল করিবে জীবন আমার বিফল বাসনারাশি ॥

[শান্তিনিকেতন]
৪ কার্তিক ১৩০১

ব্রাহ্মণ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে, ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে ; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, 'বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।'

হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক। বন্দি ফলফুলদলে

ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে,
'ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী—
সত্যকাম নাম মোর।' শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
'কুশল হউক সৌম্য, গোত্র কী তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' বালক কহিলা ধীরে,
'ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য, করো অনুমতি।'
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম ঘন-অন্ধকার
বনবীথি দিয়া ; পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে, জননীকুটিরে
করিলা প্রবেশ ॥

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি ; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
'কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে ; গুরু কহিলেন মোরে—
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার ?'

শুনি কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে ;
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে ;
গোত্র তব নাহি জানি তাত !'

পরদিন
তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক—
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি, সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলিগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণকণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি॥

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম ;
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস করি শুধাইলা তবে.
'কী গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়দরশন ?'
তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি— সত্যকাম,
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,

জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।'

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো। সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ-বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি, বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।'

[শিলাইদহ]
৭ ফাল্গুন ১৩০১

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে—
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ, চীৎকার করি 'কেষ্টা'—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে—
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা—
মহাকলরবে গালি দেই যবে 'পাজি হতভাগা গাধা'।
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার, বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকো—
রহিল তোমার এ ঘরদুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল— শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার।
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!'
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধ'রে—
বলি তারে, 'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।'
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতরচিত্ত—
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে, মোর পুরাতন ভৃত্য॥

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।'
আমি কহিলাম, 'আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে।'
রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত-বা সহিব নিত্য?
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য॥

নামিনু শ্রীধামে; দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।

জন-ছয়-সাতে মিলি একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা ; মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে।—
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি !
কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত ! আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে-যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ—
আমি একা ঘরে, ব্যাধিখরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ, ক্ষীণ, 'কেষ্ট, আয় রে কাছে,
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।'
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, 'কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানিরে দেখিতে পাইবে পুন।'
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে,
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন, বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এত দিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

[শিলাইদহ]
১২ ফাল্গুন ১৩০১

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন ? এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই—
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাঁই।'

শুনি রাজা কহে, ‘বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।’ কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, ‘করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!’
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, ‘আচ্ছা, সে দেখা যাবে।’

পরে মাস-দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এইমত কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল॥

নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল নিশীথশীতলস্নেহ।

বুক-ভরা-মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা নন্দীর-গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে॥

ধিক্ ধিক্ ওরে, শত ধিক্ তোরে নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার— এই কি জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাক-পাতা!
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঙ্গদে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন!
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন—
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোনো চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি।
যত হাসো আজ, যত করো সাজ, ছিলে দেবী— হলে দাসী॥

বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ একি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।
সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!

সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখণে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা॥

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী।
ঝুঁটিবাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, 'আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব।'
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ—
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন।'
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!'
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়!'
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে॥

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

নগরসংগীত

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত নবনির্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীলবসনপ্রান্ত সুন্দর শুভ ধরণী!
আকাশ আলোকপুলকপুঞ্জ, ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ— কোথা নিয়ে এল তরণী!
ওই রে নগরী, জনতারণ্য— শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি কতই পণ্য, কত কোলাহলকাকলি!
কত-না অর্থ কত অনর্থ আবিল করিছে স্বর্গমর্ত,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত উঠিছে শূন্য আকুলি।

সকলি ক্ষণিক খণ্ড ছিন্ন পশ্চাতে কিছু রাখে না চিহ্ন,
পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন, ছুটিছে মৃত্যুপাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য, প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষমাত্র, চাহে নাকো পিছু প্রবাসযাত্র-
বিরামবিহীন দিবসরাত্র চলেছে আঁধারে আলোকে।
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য স্বর্ণঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত ছুটিছে বৃদ্ধবালকে।
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড, আকাশে আলোড়ি শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ জীবন-আহুতি ঢালিয়া।
চারি দিকে ঘিরি যতেক ভক্ত স্বর্ণবরনবরণাসক্ত—
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত, সকল শক্তিসাধনা।
জ্বলি উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে ধূমায়ে শূন্য-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে,
লুপ্ত করিছে সূর্য চন্দ্রে বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।
বায়ুদলবল হইয়া ক্ষিপ্ত ঘিরি ঘিরি সেই অনল দীপ্ত
কাঁদিয়া ফিরিছে অপরিতৃপ্ত ফুঁসিয়া উষ্ণ শ্বসনে।
যেন প্রসারিয়া কাতর পক্ষ কেঁদে উড়ে আসে লক্ষ লক্ষ
পক্ষীজননী করিয়া লক্ষ্য খাণ্ডব-হুত-অশনে।
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র
খুলেছে জীবনযজ্ঞ রুদ্র আবালবৃদ্ধরমণী—
হেরি এ বিপুল দহনরঙ্গ আকুলহৃদয় যেন পতঙ্গ
ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ— কাটিবারে চাহে ধমনী।
হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য উছসি উছলি পড়িছে সদ্য—
আমি তাহা পান করিব অদ্য, বিস্মৃত হব আপনা।
অয়ি মানবের পাষাণী ধাত্রী, আমি হব তব মেলায় যাত্রী
সুপ্তিবিহীন মত্তরাত্রি জাগরণে করি যাপনা।

ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ, বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ, পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ— বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট, কখনো ইষ্ট কভু অনিষ্ট,
কখনো তিক্ত কখনো মিষ্ট— যখন যা দেয় তুলিয়া—
সুখের দুখের চক্রমধ্যে কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে নাগরদোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য—
যাহা-কিছু আছে অতি অসাধ্য তাহারে ধরিব সবলে।
আমি নির্মম, আমি নৃশংস সবেতে বসাব নিজের অংশ—
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি—
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি, কোনো ভেদ নাহি উভয়ে।
ধনসম্পদ করিব নস্য, লুণ্ঠন করি আনিব শস্য—
অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব ছুটাব বিশ্বে অভয়ে।
নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা, নিত্যনূতন কর্মনিষ্ঠা—
জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ, নাহি তার আদি, নাহিকো অন্ত—
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত সিন্ধু-শৈল-সরিতে।
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষি আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী—
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী আলেয়া-হাস্যে-ধাঁধিয়া।
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা— আনিব তোমারে বাঁধিয়া।
মানবজন্ম নহে তো নিত্য, ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য— কালনদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি— কেবলমাত্র দু-চারি দিবস, দু-চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র জনসংঘাতমদিরা॥

চিত্রা

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত-না বর্ণে কত-না স্বর্ণে গঠিত,
কত-যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত,
কত-না গ্রন্থে কত-না কণ্ঠে পঠিত—
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী॥

অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারি দিকে চির যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নৃত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি—

তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ননীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা,
অয়ি প্রশান্তহাসিনী!
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী,
তুমি অন্তরবাসিনী॥

[সাহাজাদপুর]
১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২

আবেদন

ভৃত্য। জয় হোক মহারানী, রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে করো দয়া।

রানী। সভা ভঙ্গ করি
সকলেই গেল চলি যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্য-মাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান লয়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্বে বাজায়ে। সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক-সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর। কী প্রার্থনা?

ভৃত্য। মোর স্থান
সর্বশেষে, আমি তব সর্বাধম দাস
মহোত্তমে। একে একে পরিতৃপ্ত-আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জন সভায়,
একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে ব'সে ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব-অবশেষটুকু।

রানী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কী তোরে মিলিবে?

ভৃত্য। হাসিমুখ
দেখে চলে যাব। আছে দেবী, আরো আছে-
নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে, এক কর্ম কেহ চাহে নাই,
ভৃত্য-'পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। মালাকর?

ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে, এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব— যত উচ্চ কাজ
সব ফিরে লও দেবী। তব দূত করি
মোরে আর পাঠায়ো না, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে লয়ে; জয়ধ্বজা তব
দিগ্‌দিগন্তে ক'রিয়া প্রচার, নব নব
দিগ্বিজয়ে পাঠায়ো না মোরে। পরপারে
তব রাজ্য কর্মযশধনজনভারে
অসীমবিস্তৃত; কত নগর নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণিতে কত পণ্য! ওই দেখো দূরে
মন্দিরশিখরে আর কত হর্ম্যচূড়ে
দিগন্তেরে করিছে দংশন, কলোচ্ছ্বাস
শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্যনীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব, জাগে নিত্য

কতই প্রহরী ! এ পারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদসৌধ, অনিন্দ্য নির্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরী-বিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোতকলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা ; স্ফটিকপ্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোলক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘদিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল
করুণাকাতর। অদূরে অলিন্দ-'পরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী ; রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল
বাঁকায়ে ধবলগ্রীবা ; পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে।— অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কী কাজে লাগিবি ?

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়— শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যুষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে

করি দিয়া বিসর্জন, সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি। পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশতৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি, আমি নিজ করে
রচি সে বিচিত্র মালা সান্ধ্যযূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণপাত্রে, তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনতমুখে—
যেথায় নিভৃত কক্ষে ঘন কেশপাশ
তিমিরনির্ঝরসম-উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গকুটিল এলাইয়া পৃষ্ঠ-'পরে,
কনকমুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্মকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতীদোলায়, পত্রচ্ছদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন,
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনাবিভোল
নিশ্বাসের প্রায়— মৃদুছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ-পানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি— সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।

শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব রানী,
বসন বাসন্তী রঙে ; পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ্র আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। কী লইবে পুরস্কার ?

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব,
এই পুরস্কার।

রানী। ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী,
বহু সৈন্য, বহু সেনাপতি, বহু যন্ত্রী
কর্মযন্ত্রে রত— তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন, কর্মহীন।
রাজসভাবহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর,
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

[বোট। শিলাইদহ-অভিমুখে]
২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২

উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী,
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসংগীতে
অকলঙ্কহাস্যমুখে প্রবালপালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?

যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা ॥

যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী !
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ-সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সংগীতে ।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎচঞ্চলা ॥

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা ।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসংবৃতে ॥

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী ।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা—
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার ।

অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনী ।

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী !
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে ।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব সংগীতে
রবে তরঙ্গিতে ।

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী !
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি ।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে ।

[বোট । শিলাইদহ-অভিমুখে]
২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে । পুণ্যবল হল ক্ষীণ,

আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন
হে দেব, হে দেবীগণ। বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে। অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শতশত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যত্তপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হত মর্তের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ; নন্দনকানন
মর্মরিয়া উঠিত নিশ্বসি, মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী
কলকণ্ঠে, সন্ধ্যা আসি দিবা-অবসানে
নির্জনপ্রান্তরপারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী, নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্যসংগীত
নক্ষত্রসভায়। মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনকনূপুরে
তালভঙ্গ হত। হেলি উর্বশীর স্তনে

স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝংকারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্ছনা। দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতি-পাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি। ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস— খসি ঝরি
পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরি॥

থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে— করো সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক্ সুখে-দুঃখে-অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি॥

হে অপ্সরী,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়

কভু না হউক ম্লান— লইনু বিদায়।
তুমি কারে কর না প্রার্থনা, কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো-এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নতনয়নে,
চন্দনচর্চিতভালে, রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরিসংগীতে। তার পরে,
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্রশিয়রে। দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম, যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো— নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে

লভাইবে বক্ষে মোর। দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্তভূমি, আজি বহুদিন-পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পুরিল, অমনি এ স্বর্গলোক
অলসকল্পনাপ্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীলগিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা— বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত, আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে,
যখনি ফিরিব পুন তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ— স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে-সুখে-ভয়ে-ভরা প্রেমের সংসারে

তব গেহে, তব পুত্র-কন্যার মাঝারে
আমারে লইবে চিরপরিচিতসম।
তার পরদিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই—
'যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই'॥

[শিলাইদহ]
২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২

দিনশেষে

দিনশেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী—
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
'হাগো, এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে'
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি
অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী॥

নামিছে নীরব ছায়া ঘনবনশয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে—
শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে॥

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া-করা,
ছেয়ে গেছে ঝরে-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন বেড়া-দেওয়া উপবন
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে॥

রাজার প্রাসাদ হতে অতিদূর বাতাসে
ভাসিছে পুরবীগীতি আকাশে।
ধরণী সমুখপানে চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরান কেন কে জানে উদাসে।
ভালো নাহি লাগে আর আসা-যাওয়া বারবার
বহুদূর দুরাশার প্রবাসে।
পুরবী রাগিণী বাজে আকাশে॥

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচা কেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী॥

[শিলাইদহ]
২৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২

সান্ত্বনা

কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার?
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বলো আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার।

হেথায় প্রান্তরপারে নগরীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে জ্বালি দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্যমনে একাকিনী বাতায়নে
বসে আছি পুষ্পাসনে বাসরের রানী—
কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখি?
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি?।

চারি দিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি
মায়ামন্ত্র-ঘের;
দুয়ার রেখেছি রুধি চেয়ে দেখো কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ, নিখিলের সবশেষ,
মিলনের রসাবেশ-অনন্তভবন,
শুধু এই এক ঘরে দুখানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে॥

একখানি বীণা আছে, কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব কোরে;
একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।
এক শয্যা রাজধানী, আধেক আঁচলখানি
বক্ষ হতে লয়ে টানি পাতিব শয়ন—

একটি চুম্বন গড়ি দোঁহে লব ভাগ করি,
এ রাজত্বে মরি মরি এত আয়োজন।
একটি গোলাপফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,
তব ঘ্রাণশেষে
আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি তাহা
পরি লব কেশে॥

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গলপ্রদীপ ধ'রে লইব বরণ ক'রে,
পুষ্পসিংহাসন-'পরে বসাব তোমায়,
তাই গাঁথিয়াছি হার, আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার কনকবীণায়।
আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতূহলে—
আজ কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন্,
নয়নের জলে?।

রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা, কহিয়ো না কোনো কথা,
কিছু শুধাব না।
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা।
প্রদীপ নিবায়ে দিব, বক্ষে মাথা তুলি নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব সজল কপোল,
বেণীমুক্ত কেশজাল স্পর্শিবে তাপিত ভাল,
কোমল বক্ষের তাল মৃদুমন্দ দোল।

নিশ্বাসবীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন —
অর্ধরাতে শান্তবায়ে নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন।

[শিলাইদহ]
২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২

বিজয়িনী

অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়সঘন
পল্লবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে, কপোতদম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে এক প্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত; শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে, আয়ুপরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ।
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে; নূপুর রয়েছে পড়ি;
বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি

ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনকদর্পণখানি চাহে শূন্য-পানে
কার মুখ স্মরি। স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দনকুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্তশতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেতকরবীর মালা, ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মতো।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত,
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুক-ভরা আলিঙ্গনরাশি। সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে,
শ্বেতশিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছ নীরে— বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসটিরে
করিছে সোহাগ, নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানাদুটি, লম্বগ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ-'পরে কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপবাণী; কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশবিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে। সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে,
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে,
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশবীণার

রবিরশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সংগীতঝংকারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল মৌনস্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলই
অশ্রান্ত গাহিতেছিল, বিফলকাকলি
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবর-প্রান্তদেশে ক্ষুদ্রনির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্যকিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল , তৃণাঙ্কিত তীরে
জলকলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়ে ছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে , রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বরচঞ্চল
ত্যজি কোন্ দূরনদীসৈকতবিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিতনীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ ব'হে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধবাহুপাশে॥

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়া ছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু-'পরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।

পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতীমালা কুঞ্চিত কুন্তলে
গৌর কণ্ঠতটে। সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে; ছায়াতলে সুপ্তহরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধনয়ন মৃগ; বসন্তপরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে॥

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী—
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র— ললাটে, অধরে,
উরু-'পরে কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার; সেবকের মতো

সিক্ত তনু মুছি দিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্তপদতলে
চ্যুতবসনের মতো রহিল পড়িয়া ;
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া ॥

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব ॥

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা । মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে । পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক্ বিস্ময়ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি । নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে ॥

১ মাঘ ১৩০২

জীবনদেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিতদ্রাক্ষাসম ।
কত যে বরন কত যে গন্ধ
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসরশয়ন তব—

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্যনব ॥

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত—
আমার নর্ম, আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে ?
বরষা-শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে ?
মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে—
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবনবনে ?।

কী দেখিছ, বঁধু, মরম-মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ —
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার—
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী আমি কি গাহিতে পারি ?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রুবারি ॥

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ, যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ জাগরণ ঘুমঘোর ?

শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন—
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীনজীবনডোরে ॥

২৯ মাঘ ১৩০২

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বন-ভরা সরস বিম্বাধরে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে মধুর আবেশভরে।
তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার কমলকোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন, মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি—
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, হাসিমুকুলিত মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে নবীনমিলনসুখে।

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জননদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশিতে উঠেছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায় জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণসিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা!
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনতশিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জননদীতীরে।

১ ফাল্গুন ১৩০২

১৪০০ সাল

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে!
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—

অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে ?।

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণদ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
একদিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে,
নবীন ফাল্গুনদিন সকল-বন্ধন-হীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণসমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শতবর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে,
কবি এক জাগে—
কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,
একদিন শতবর্ষ আগে।

আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে!
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন

পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে॥

২ ফাল্গুন ১৩০২

সিন্ধুপারে

পউষ প্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি,
নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণদীপ বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে—
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম-
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্মে বাজিল স্বর—
ঘর্ম বহিল ললাট বাহিয়া রোমাঞ্চকলেবর।
ফেলি আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরলবসন বেশে,
দুরুদুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।
দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি,
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখি।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমুরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে, পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরন, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশানধূমে।
নড়িল না কিছু, আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে-
শিহরি শিহরি সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।

পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর-গ্লানি-মাখা,
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিহরে নগ্নশাখা।
নীরবে রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন-সম চড়িনু অশ্ব-'পরি॥

বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া— বারেক চাহিনু পিছে।
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান মনে হল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে!
পথের দু ধারে রুদ্ধদুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধসারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখশয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে—
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে—
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদশিখরে প্রহরঘণ্টা বাজে॥

অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই—
অপরূপ এক স্বপ্নসমান, অর্থ কিছুই নাই।
কী যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগাগোড়া—
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা,
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলই বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা-মতো মনে হয় থেকে থেকে—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হল মেঘ, মনে হল পাখি, মনে হল কিশলয়—
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল,
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল!

মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে—
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে উঠে বুকে।
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে—
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে, ঘোড়া চলে যায় ছুটে॥

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্বদিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি,
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি।
সাগরে না শুনি জলকলরব, না গাহে উষার পাখি,
বহিল না মৃদু প্রভাতপবন বনের গন্ধ মাখি।
অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে—
আঁধারব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।
ভিতরে ক্ষোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ-'পরে,
কনকশিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির গায়ে পাষাণমূর্তি চিত্রিত আছে কত—
অপরূপ পাখি, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানামতো।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা—
তারি তলে মণিপালঙ্ক-'পরে অমল শয়ন পাতা।
তারি দুই ধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।
নাহি কোনো লোক, নাহিকো প্রহরী, নাহি হেরি দাসদাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃতবদনে বসিলা শয্যা-'পরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি পাশে বসাইল মোরে।
হিম হয়ে এল সর্বশরীর, শিহরি উঠিল প্রাণ—
শোণিতপ্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান!

সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণা বেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্পরেণু ;
দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল দীপের আলোকরাশি—
ঘোমটা-ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে—
শুনিয়া চমকি ব্যাকুলহৃদয়ে কহিলাম জোড়করে,
'আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে—
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে !'

অমনি রমণী কনকদণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলুকলরব-সাথে—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদূর্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাতনারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ-বা চামর, কেহ-বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল— বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কষি।
আঁকিতে লাগিল কত-না চক্র, কত-না রেখার জাল ;
গণনার শেষে কহিল, 'এখন হয়েছে লগ্নকাল !'
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিতমত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়ালো একটি কথা না বলি
দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়া দোঁহে
কী ভাষা কী কথা কিছু না বুঝিনু দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।

চলি গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র ; পশ্চাতে বাঁধি সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার ।
শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে লয়ে দীপখানি ;
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার, কারো মুখে নাই বাণী ।
কত-না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু, সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার ।
কী দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব হয়ে যায় মনোভুল—
নানা বরনের আলোক সেথায়, নানা বরনের ফুল ,
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত !
মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্নরচিতমত ।
পাদপীঠ-'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ ;
আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখি নি শুধু !'

চারি দিক হতে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুকহাসি,
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি ।
সুধীরে রমণী দু বাহু তুলিয়া অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী ।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে—
'এখানেও তুমি জীবনদেবতা !' কহিনু নয়নজলে ।
সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধা-ভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি !
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে ,
অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে ;
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি ।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি ।

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা । ২০ ফাল্গুন ১৩০২

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল।
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

তুমি এসো নিকুঞ্জনিবাসে,
এসো মোর সার্থকসাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্বসমর্পণ।
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদননিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি—
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহো তুলি তুলি।
তব ওষ্ঠে দশনদংশনে
টুটে যাক পূর্ণফলগুলি।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মরনিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল॥

১৩ চৈত্র ১৩০২

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?'
দেবতা কহিলা, 'আমি।' শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, 'কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?'
দেবতা কহিলা, 'আমি।' কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, 'তুমি কোথা প্রভু!'
দেবতা কহিলা, 'হেথা।' শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিল, 'ফির।' শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!'

১৪ চৈত্র ১৩০২

মধ্যাহ্ন

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্যঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছপক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ— চলে যায় বহুদূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য-'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর— মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী॥

প্রবাসবিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে।
ফিরিয়া এসেছি যেন আদিজন্মস্থলে
বহুকাল পরে ; ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে— জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

১৫ চৈত্র ১৩০২

দুর্লভ জন্ম

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন-'পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিন এইমতো পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগৎ-'পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।
সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলই দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাই নি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ বলে যা চাই নি তাই মোরে দাও।

১৮ চৈত্র ১৩০২

খেয়া

খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে ;
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

১৮ চৈত্র ১৩০২

ঋতুসংহার

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন-'পরে।
মরকতপাদপীঠ-বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণরাজছত্র ঊর্ধ্বে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে। ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি—

নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব-নব-বর্ণ-ময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে। ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী—
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

২০ চৈত্র ১৩০২

মেঘদূত

নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ।
ঊর্ধ্ব হতে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন, মিলনের মরীচিকা
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়াকুহেলিকা
খররৌদ্রকরে। ছয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র, সভা ভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গযবনিকা—
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা,
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারি দিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম। বিশ্বসভা-মাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

২১ চৈত্র ১৩০২

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরই ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে। আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার, পিত্তলকঙ্কণ
পিতলের থালি-'পরে বাজে ঠন্ ঠন্।
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা পাখিটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থিরধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে,
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর। জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি-ছোটো দিদি।

২১ চৈত্র ১৩০২

পরিচয়

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি-'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল সেই নদীতীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।

বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে প'ড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে।

২১ চৈত্র ১৩০২

ক্ষণমিলন

পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়
তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায়।
দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখি পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে!
এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর!
মুহূর্ত-আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম।

২২ চৈত্র ১৩০২

সঙ্গী

আরেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে।
একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে

একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্নবেলা
কবরী বাঁধিতেছিল বসিয়া একেলা।
পালিত কুক্কুরশিশু আসিয়া পিছনে
কেশের চাঞ্চল্য হেরি খেলা ভাবি মনে
লাফায়ে লাফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারম্বার!
বালিকা ভর্ৎসিল তারে গ্রীবাটি নাড়িয়া,
খেলার উৎসাহ তার উঠিল বাড়িয়া।
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জনী,
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গণি।
তখন হাসিয়া উঠি লয়ে বক্ষ-'পরে
বালিকা বাঁধিল তারে আদরে আদরে॥

২৩ চৈত্র ১৩০২

করুণা

অপরাহ্নে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড়। কর্মশালা হতে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
ঊর্ধ্বশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কশাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানির খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি,
পাষাণকঠিন পথ উঠিল শিহরি।
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার—
স্বর্গে যেন মায়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্ধ্ব-পানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা॥

২৪ চৈত্র ১৩০২

স্নেহগ্রাস

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী,
হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহপরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।

২৫ চৈত্র ১৩০২

বঙ্গমাতা

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি— তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে—মানুষ কর নি।

২৮ চৈত্র ১৩০২

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

২৮ চৈত্র ১৩০২

মৌন

যাহা কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়,
মন বলে মাথা নাড়ি—এ নয়, এ নয়।

যে কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম !
সে শুধু ভরিয়া উঠি অশ্রুর আবেগে
হৃদয়-আকাশ ঘিরে ঘনঘোর মেঘে ;
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বিদীর্ণ রেখায়
অন্তর করিয়া ছিন্ন কী দেখাতে চায় !
মৌন মূক মূঢ় -সম ঘনায়ে আঁধারে
সহসা নিশীথরাত্রে কাঁদে শতধারে।
বাক্যভারে, রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ,
কোথায় হারায়ে এলি তোর যত গান।
বাঁশি যেন নাই, বৃথা নিশ্বাস কেবল—
রাগিণীর পরিবর্তে শুধু অশ্রুজল ॥

২০ চৈত্র ১৩০২

অসময়

বৃথা চেষ্টা রাখি দাও। স্তব্ধ নীরবতা
আপনি তুলিবে গড়ি আপনার কথা।
আজি সে রয়েছে ধ্যানে — এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গভয়ভীত তপোবন-সম।
এমন সময় হেথা বৃথা তুমি, প্রিয়া,
বসন্ত কুসুমমালা এসেছ পরিয়া ;
এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি—
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোনো গীতি।
শুধু এ মর্মরহীন বনপথ-'পরি
তোমারি মঞ্জীরদুটি উঠিছে গুঞ্জরি।
প্রিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে ;
কালিকার গান আজি আছে মৌনী হয়ে।

তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল ;
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল ॥

২৯ চৈত্র ১৩০২

কুমারসম্ভব গান

যখন শুনালে, কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান, চারি দিকে ঘিরে
দাঁড়ালো প্রমথগণ। শিখরের 'পর
নামিল মন্থরশান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত ;
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে— যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ননিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবী-পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে ॥

১৫ শ্রাবণ ১৩০১

মানসলোক

মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দিরপ্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস—
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধনীলভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,
জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।

আজিও মানসধামে করিছ বসতি—
চিরদিন রবে সেথা, ওহে কবিপতি,
শঙ্করচরিত-গানে ভরিয়া ভুবন।
মাঝে হতে উজ্জয়িনী-রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্নক্ষণপ্রভা।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি-
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি॥

১৫ শ্রাবণ ১৩০৩

কাব্য

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আমাদেরই মতো
হে অমর কবি? ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা-ষড়চক্র, আঘাত গোপন?
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর— নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি?
তবু সে-সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান॥

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

হাতে-কলমে

বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরই তরে মধুকর এত করে জাঁক !
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো দেখে যাই ॥

গৃহভেদ

আম্র কহে, একদিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি—
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি ॥

পরজের আত্মীয়তা

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি রে ?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে

কুটুম্বিতা

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই ব'লে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা ;
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা ॥

উদারচরিতানাম্

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্-ধিক্ করে তারে কাননে সবাই ;
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই ?।

অসম্ভব ভালো

যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো ?
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

বজ্র কহে, দূরে আমি থাকি যতক্ষণ
আমার গর্জনে বলে মেঘের গর্জন,
বিদ্যুতের জ্যোতি বলি মোর জ্যোতি রটে,
মাথায় পড়িলে তবে বলে— 'বজ্র বটে !'

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'— হাসে অন্তর্যামী॥

উপকারদম্ভ

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

সন্দেহের কারণ

'কত বড়ো আমি' কহে নকল হীরাটি।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক্ খাঁটি॥

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

নিজের ও সাধারণের

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে॥

মাঝারির সতর্কতা

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে॥

নতিস্বীকার

তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে॥

কর্তব্যগ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি—
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি॥

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা ॥

মোহ

নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ও পার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলই ও পারে ॥

ফুল ও ফল

ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,
কত দূরে রয়েছিস বল্ মোরে বল্ !
ফল কহে মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি—
তোমারই অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি ॥

প্রশ্নের অতীত

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা ?
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর ?
হিমাদ্রি কহিল, মোর চিরনিরুত্তর ॥

মোহের আশঙ্কা

শিশু পুষ্প আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা—
শ্যামল, সুন্দর, স্নিগ্ধ, গীতগন্ধ-ভরা,
বিশ্বজগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
আমি যতকাল থাকি তুমিও থাকিয়ো ॥

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে ?
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি

এক পরিণাম

শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম তারা !
তারা কহে, আমারো তো হল কাজ সারা—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি।

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা !

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি—
'এসো এসো' সুরে করুণমিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন—
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন—
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৫ বৈশাখ ১৩০৪

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে।
দিগ্‌বধূচিত-হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ কিঙ্কিণীকলকলনা,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী,
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী।

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরি তমালকুঞ্জতিমিরে—
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে—
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে, সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—

দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৭ বৈশাখ ১৩০৪

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।
অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, এই আমি!'

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলে নি দীপ,
পরিতেছিলেম কপালে সোনার টিপ।
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন-মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে।

ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি,
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়েছে ধূলি।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ক্লান্ত চরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, এই আমি!'

ফাগুনযামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারি,
দুয়ারসমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁওয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠি পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, এই আমি!'

বোলপুর
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মার্জনা

প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি,
দয়া করে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
ভীরু পাখি আমি তব পিঞ্জরে এসেছি,
তাই ব'লে দ্বার কোরো না রুদ্ধ কোরো না।

যাহা-কিছু মোর কিছুই পারি নি রাখিতে,
উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
তুমি রাখো ঢাকি, তুমি করো মোরে করুণা—
আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা কোরো
মার্জনা।

প্রিয়তম, যদি নাহি পারো ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা মার্জনা কোরো মার্জনা।
দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
অসহায়া-পানে চেয়ো না, বন্ধু, চেয়ো না।
সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
দু হাতে ঢাকিব নগ্নহৃদয়বেদনা—
প্রিয়তম, তুমি অভাগীরে কোরো মার্জনা কোরো
মার্জনা।

প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
সুখরাশি মোর মার্জনা কোরো মার্জনা।
সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া,
দূর হতে বসি হেসো না তখন হেসো না।
রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা—
তখন, হে নাথ, গরবিরে কোরো মার্জনা কোরো
মার্জনা।

বোলপুর
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে॥

মহাকালমন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীরমন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা॥

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে॥

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।

দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো, সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত-বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বামপয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে, মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি। নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে!
নাহি জানি কখন্ কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণকরে কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো। মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্ম-সম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে। ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

বোলপুর
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পূর্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে,
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু-পবনে,
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ-তরুণী।
বকুলবনে পবন হ'ত সুরার মতো সুরভি,
পরান হ'ত অরুণবরুণী।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুলমুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী।

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধু মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী—
নূপুরদুটি বাজাত লালসে।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি আকুলনয়নে।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে—
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

তেমনি আজো উদিছে বিধু, মাতিছে মধুযামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিলশিথিল দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখিরে,
মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী।
গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী।

এসো গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে।

এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে—
নবীন করো মানবঘর, ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে॥

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী॥

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণা-যন্ত্রে মহাপুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা!
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা॥

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে!

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে!
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে—
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

প্রণয়প্রশ্ন

এ কি তবে সবই সত্য,
হে আমার চিরভক্ত?
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য?
আমার মধুর অধর বধূর নবলাজ-সম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য?।

চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি,
চরণে আমার বীণাঝংকার বাজে কি,
এ কি সত্য?
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া,
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য?
তপ্তকপোল-পরশে অধীর সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য?।

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
জীবনমরণ-বাঁধন বাহুতে বাঁধা রে,
এ কি সত্য ?
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য ?
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি, আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?।

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া,
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চির জনমের বিরাম লভিলে পলকে,
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাটফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?।

রেলপথে
১৩ আশ্বিন ১৩০৪

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, 'শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র,
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাঝে চরণ ফেলা মাত্র।

তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি!
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।'

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গবু হবুর পাদপদ্মে—
'যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!'

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে, 'কথাটা বটে সত্য—
কিন্তু আগে বিদায় করো ধুলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন-বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে!
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নস্য,
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য!'
কহিল রাজা, 'তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছে কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখবক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য,
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, 'করিতে ধুলা দূর
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর!'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে-ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি!
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।

পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা!'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাস পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র!
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাঁটি—
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে
যোগ্যমত চামার যদি মেলে।'

রাজার চর ধাইল হেথা-হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।

যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
না মিলে এত উচিতমত চর্ম।
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে!
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।'
মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।'
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে—
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।'
সেদিন হতে চলিল জুতা পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা॥

১৩০৪

হতভাগ্যের গান

কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জানো ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা, নাইকো তাহে প্রতারণা—
টানো যখন মরণফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

ধরায় যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে—
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব, যাহাই দিবে তাহাই লব—
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি মাথায় বহি সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে, মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা দিক, মা, এঁকে তোমার টিকা—
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কাশী।
আত্মপরের-প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা—
থাকবে তুমি, থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

শঙ্কাতরাস লজ্জাশরম চুকিয়ে দিলেম স্তুতিনিন্দে।
ধুলো, সে তোর পায়ের ধুলো, তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, 'ঠাকুরানি, তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস!'
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি'
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস॥

পতিসর
৭ আষাঢ় ১৩০২

অশেষ

আবার আহ্বান?
যতকিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন,
মাঠের পশ্চিমশেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে—
তবুও আহ্বান?।

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার-আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা—
দিনের কল্লোল-'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে—
নাহি পায় সীমা।
নয়নপল্লব-'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান,
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি-সম—
এখনো আহ্বান ?।

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারই আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ—
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ !
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরই আপনার
একেলার স্থান—
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান।

দক্ষিণসমুদ্রপারে তোমার প্রাসাদদ্বারে
হে জাগ্রত রানী

বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্তসুরে ক্লান্ততালে
বৈরাগ্যের বাণী ?
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখিগণে
আঁধার শাখায় ?
তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায় ?
লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন—
এখনো আহ্বান ?।

রহিল রহিল তবে— আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে-গাঁথা মালা।
খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে পড়ে যাক খসি
কুটিরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।

বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ—
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ ?

যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়ো নাকো ঘৃণাভরে, কোরো নাকো অনাদরে
মোরে অপমান—
মনে রেখো হে নিদয়ে মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান॥

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্রশত
তোমার দুয়ারে—
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাকো ক্ষণে ক্ষণে।
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারা রাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্রনয়ান—
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান॥

হবে, হবে, হবে জয়— হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—

নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান॥

বিদায়

ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো— হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়,
শুধু সমাপন—
শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

দিনান্তের নম্র কর পড়ুক মাথার 'পর,
আঁখি-'পরে ঘুম—
হৃদয়ের পত্রপুটে গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।
আরতির শঙ্খরবে নামিয়া আসুক তবে
পূর্ণ পরিণাম—
হাসি নয় অশ্রু নয়, উদার-বৈরাগ্য-ময়
বিশাল বিশ্রাম॥

প্রভাতে যে পাখি সবে গেয়েছিল কলরবে
থামুক এখন।
প্রভাতে যে ফুলগুলি জেগেছিল মুখ তুলি
মুদুক নয়ন।
প্রভাতে যে বায়ুদল ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক থেমে যাক।
নীরবে উদয় হোক অসীম নক্ষত্রলোক
পরমনির্বাক্।

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির— মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে—
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।

১০ চৈত্র ১৩০৪

বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া—
হানি দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান—

গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান ॥

ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে
ছুটে চলে চাষি—
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎবিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকারঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দয় ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান, প্রাণ-ভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি— ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

মুক্ত করি দিনু দ্বার— আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়গর্জনস্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ—
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা-সামমন্ত্র-সম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ডমূর্তি ধরি
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখসুখ, পুরাতন তাপপরিতাপ,
কম্প লজ্জা ভয়—
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্-দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,

তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি—
এবার আস নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে—
ধন্য ধন্য তুমি।
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম না'ই বুঝিলাম,
জয় তব জয়।

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজপ্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ —
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান'
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জানো।

উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চিরেখা—
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন—
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরি,
করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্—
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি-নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—

সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান্‌ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব—
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ—
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ততমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন।
মেঘের অন্তর-পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে।

৩০ চৈত্র ১৩০৫

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে
হেমন্ত-ধানের ক্ষেতে বাতাস উঠেছে মেতে—
কেমনে চলিবে পথ চিনে ?।

দেখিছ না, ওগো সাহসিকা,
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা ?
মনে ভেবে দেখো তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
কবরীর শেফালিমালিকা ?।

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল,
গ্রামপথে যাবে কী লজ্জায় ?।

হে উতলা, শোনো কথা শোনো—
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো ?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে,
ব'সে কেহ আছে কি এখনো ?।

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে ?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে ?।

মেঘ যদি ডাকে গুরু-গুরু,
নৃত্য-মাঝে কেঁপে ওঠে ঊরু,
কাহারে করিবে রোষ— কার 'পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরুদুরু ?।

যাবে যদি, মনে ছিল না কি—
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?
আমি তো পথেরই ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী।

কখন প্রহর গেছে বাজি,
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি।

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান হ'ত,
আমি নাহি করিতাম ডর।

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে—
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম,
মিশে যেত আকাশে পাতালে।

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ংকর।
তোমার নূপুররাজি প্রলয়ে উঠিত বাজি,
বিজুলি হানিত আঁখি-'পর।

কেন আজি যাও একাকিনী ?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী ?
এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী ?।

বসন্ত

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
মত্ত কুতূহলী
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণদুয়ার
মর্তে এলে চলি—
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটিরপ্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দারমঞ্জরি—
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
লয়ে বীণা বেণু,
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু ॥

সখা, সেই অতিদূর সদ্যোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণমদিরায়
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্তপ্রবীণ
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজও পুনর্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা ॥

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা—
অশ্রু, গান, হাসি।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা-কাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্নসেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত-পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে॥

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে-কয়টি কথা
তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা!
সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিতশুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্নমিতা
একান্ত কৌতুকী,
কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবনকাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি—
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনাবাঁশরি॥

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস,

তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।
বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে—
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে—
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে ছিন্না বীণার তন্ত্রী বিরতা—
সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ তোমার আরতিবারতা।
তব মন্দির স্থিরগম্ভীর ভাঙা দেউলের দেবতা!

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য, রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারি!
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারি।

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব, কত পূজানিশা বিগতা!

কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা কত যায় কত কব তা
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন ভাঙা দেউলের দেবতা

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ?।

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !
কী ভীম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর—
ছায়ামূর্তি তব অনুচর ॥

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্র বেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ—
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ ॥

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে
শুষ্কজল নদীতীরে, শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী—
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী ॥

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর—
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার—
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে—
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে—
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থছায়াতে—
সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে।

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধুলা-সম উড়ুক গগনে,
ভরে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ-সনে
আকুল আকাশ—
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে— বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারীহিয়া
চিন্তায় বিকল—
দাও পাতি গেরুয়া

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ।
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ॥

১৩০৬

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকাদুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।' বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। 'স্থান কোথা আর'
মৈত্র কহিলেন তারে। 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে এক ধারে।' ভিজে গেল মন;
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?'
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,

বাঁচিব ছিল না আশা ; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে— সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।'

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধালো, সে কহিল, 'যাইব সাগরে।'
'যাইবি সাগরে ! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।' পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, 'যাইব সাগরে।'
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
'থাক্ থাক্, সঙ্গে যাক।' মা রাগিয়া বলে,
'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে !'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন

'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপিচুপি কয়,
'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'
রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে।'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি।' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে। জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন, শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই— যাতায়াতে মাস-দুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে ; সাঙ্গ হল মেলা,
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
'ঠাকুর, কখন্ আজি আসিবে জোয়ার?'

সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—

আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
'দেশে পঁহুছিতে আর কতদিন আছে ?'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তরবায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর ! চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ-বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্বডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে

রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন্।'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী,
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে'
একবাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো।' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।

ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা। রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'
মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি,

কী বলেছি রোষবশে ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর!
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা!
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!'

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি,
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা—
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি! মাসি! মাসি!'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্! রাখ্! রাখ্।'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে'— কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত-মাঝে ঝাঁপ দিল জলে।
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

পূজারিনি

অবদানশতক

সেদিন শারদদিবা-অবসান, শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া নীরবে দাঁড়ালো আসি।
শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা, 'এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা অথবা নির্বাসনে!'

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর সীমন্তসীমা-'পরে।
শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা, কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, 'অবোধ, কী সাহসবলে
এনেছিস পূজা! এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে বিষম বিপদ্‌পাত!'

অস্তরবির রশ্মি-আভায় খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী,
চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিণী— চাহিয়া দেখিল দ্বারে।
শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে-কানে,
'রাজার আদেশ আজি কে না জানে—
এমন করে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে!'

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী লইয়া অর্ঘ্যথালি।
'হে পুরবাসিনী' সবে ডাকি কয়,
'হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।'
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়, কেহ দেয় তারে গালি॥

দিবসের শেষ আলোক মিলালো নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজদেবালয়-ঘরে।
শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে তারা অগণ্য জ্বলে—
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
'মন্ত্রণাসভা হল সমাধান' দ্বারী ফুকারিয়া বলে॥

এমন সময়ে হেরিলা চমকি প্রাসাদে প্রহরী যত
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে প্রদীপমালার মতো?
মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি?'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।'

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদস্বচ্ছনিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা॥

১৮ আশ্বিন ১৩০৬

অভিসার

বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে ;
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত।
কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ সহসা বাজিল বক্ষে !
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীলবরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ,
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা—
'ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর,
দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর—
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা।'

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে, 'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী—
সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে হাসিল অট্টহাস্য।

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা।
অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর আজি অভিসাররাত্রি?।

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী বাহির-প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে—
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে তাঁহার চরণোপান্তে?।

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ॥

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে শীতচন্দনপঙ্কে॥

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা!'

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ

মহাবস্ত্ববদান

'রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,
নহিলে নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুণ্ড রহিবে না দেহে।' রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগরবাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে,
বিদেশী পথিক পান্থ তক্ষশিলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোয়াইয়া নিঃস্বরিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে

নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি ;
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে ॥

সেইক্ষণে
সুন্দরীপ্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি— নয়নসম্মুখে
স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে ? শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি
শ্যামা ডাকিতেছে তারে ; বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি।' শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত ; সত্বর পশিল গৃহ-মাঝে—
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে,
আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ। চলেছি সম্প্রতি
রাজকার্যে ; সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।'
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা—
'একি লীলা হে সুন্দরী, একি তব লীলা !
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে

করিতেছ অবমান!' শুনি শ্যামা কহে—
'হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।'
এত বলি সিক্তপক্ষ দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে,
'আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে,
মুক্ত করে দিয়ে যাও।' কহিল প্রহরী,
'তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।' ধরি প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, 'শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো এ মিনতি করি।'
'রাখিব তোমার কথা' কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল

অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদ স্বরে,
'বিকারের বিভীষিকা-রজনীর 'পরে
করধৃতশুকতারা শুভ্র-উষা-সম
কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুরনগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী ?'
'আমি দয়াময়ী !' রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা—
'এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।'
এত বলি দৃঢ় বলে ধরি হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে,
পূর্ববনান্তরে। ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
'হে বিদেশী, এসো এসো' কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে, 'হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবনমরণপ্রভু !'— নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ-উৎসব গান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক

বজ্রসেন শুধাইল, 'কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি, অয়ি, বিদেশিনী,
এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।' আলিঙ্গন ঘনতর করি
'সে কথা এখন নহে' কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
তূর্ণ স্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট, কোলাহল
থেমে গেছে দুই তীরে, জনপদবাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষীনীড় গীতশব্দহীন;
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন।
পক্বশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ, পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়,
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
'ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।

মোর লাগি কী করেছ জানি যদি, প্রিয়ে
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।' বস্ত্র টানি মুখোপরি
'সে কথা এখনো নহে' কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।
শুক্লচতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো, ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা। পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা, 'প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ—
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব,
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো।— বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর

উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।'

ক্ষীণচন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শতশত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহা-মাঝে; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি; মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা, মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্তনারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, 'ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর,
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।'
চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে, 'আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল? এ জন্মের লাগি.
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী

এ জীবন করিলি ধিক্কৃত ! কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী ।
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে ।'

এত বলি উঠিল সবলে । নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেল তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে । শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতিক্ষণে । ঘন গুল্মগন্ধ পুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে ; তরুকাণ্ডগুলি
চারি দিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ । রুদ্ধ হল চারি ধার ,
নিস্তব্ধনিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন । শ্রান্তকলেবর
পথিক বসিল ভূমে ।

কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম । সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্ত পদে । দুই মুষ্টি বদ্ধ ক'রে
গর্জিল পথিক, 'তবু ছাড়িবি না মোরে ?'
রমণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গসম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্তবেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার ; আর্দ্রসদ্গদবচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায় 'ছাড়িব না' 'ছাড়িব না'

কহে বারম্বার, 'তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত,
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।'
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতিস্বর; তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎবরন
মন্দিরত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদীধারে-ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।
ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে, 'কে গো গৃহছাড়া,
এসো আমাদের ঘরে।' দিল না সে সাড়া।
তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক-কণা।
দিনশেষে জরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি। শতবার

রাখিল বক্ষেতে চাপি। ঝংকার তাহার
শতমুখ শর-সম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশীকৃত করি
তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি—
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে॥

শুক্লপঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণতরুশিরে পড়িয়াছে নামি
শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন 'এসো এসো প্রিয়া'
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম!
'এসো এসো প্রিয়া!' 'আসিয়াছি প্রিয়তম!'
চরণে পড়িল শ্যামা, 'ক্ষম মোরে ক্ষম,
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে।' শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ 'পরে,
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বাহু মেলি
চমকি উঠিল, তারে দূরে দিল ঠেলি—
গরজিল, 'কেন এলি, কেন ফিরে এলি।'
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি,
জ্বলন্ত-অঙ্গার-সম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি;
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি
লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি

কহিল ফিরায়ে মুখ, যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও।' নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল; তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির-মাঝে মিলায় যেমন॥

২৩ আশ্বিন ১৩০৬

বিসর্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর
বয়স না হতে হতে পুরা দু বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন
স্বামীরেও হারালো মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল, পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা-সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে;
ব্রতধ্যান-উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে
পূজাগৃহে। কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি;
শুনে রামায়ণকথা; সন্ন্যাসী-সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।

বিশ্ব-মাঝে আপনারে রাখি সর্বনীচে
সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান-লাগি। সূর্যচন্দ্র হতে
পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি কোনোমতে
কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা, সকলের কাছে
আকুল বেদনাভরে দীন হয়ে আছে॥

যখন বছর দেড় বয়স শিশুর
যকৃতের ঘটিল বিকার; জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানত মাতা; পদামৃত লয়ে
করাইল পান; হরিসংকীর্তনগানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধালো নারী, 'ব্রাহ্মণঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর?
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা তবু রক্ষা নাই?
তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে?
এত ক্ষুধা দেবতার? এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না!'
ব্রাহ্মণ কহিল, 'বাছা, এ যে ঘোর কলি।
অনেক করেছ বটে, তবু এও বলি—
আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো?
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পারো?

দানবীর কর্ণ -কাছে ধর্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,
নিজহস্তে সন্তানে কাটিল ; তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমিষে।
শিবিরাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে ;
পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমণ্ডলে ?
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে— তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা-গঙ্গার কাছে ; শেষে, পুত্রজন্ম-পরে
অভাগী বিধবা হল। গেল সে সাগরে ;
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা-গঙ্গারে ডেকে,
'মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,
এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই।'
যেমনি জলেতে ফেলা মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনীরূপে হয়ে মূর্তিমতী
শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল। নিষ্ঠা এরে বলে।'

মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির ক'রে ;
আপনারে ধিক্কারিল, 'এতদিন ধ'রে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চনা—
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।'

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে ; অঙ্গ যেন অগ্নির মতন।
ঔষধ গিলাতে যায় যত বারবার
পড়ে যায়— কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর,
দন্তে দন্তে গেল আঁটি। বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়নশিয়রে,
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারি ধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর,
'ও মানিক, ওরে সোনা, এই-যে মা তোর,
এই-যে মায়ের কোল, ভয় কি রে বাপ !'
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল ; ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি।
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিয়া নারী
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি ;
কহিল, 'মায়ের ডাক ওই শুনা যায়—
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়—
তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা !'— জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে, এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা, গেল শূন্য ঘাট-পানে।
কহিল, 'মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে

তবে এ শিশুর তাপ দে গো, মা, জুড়ায়ে।
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
একমনে!' এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি। বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না।
ধ্যানে নিরখিল বসি, মকরবাহনা
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে করে এসেছেন রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল; হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি দেবীকোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, 'রে দুঃখিনী, এই তুই ধর্‌
তোর ধন তোরে দিনু।' রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, 'কই মা?··· কোথায়!'
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী, 'দিবি নে ফিরায়ে?'
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে।

২৪ আশ্বিন ১৩০৬

বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে 'গুরুজীর জয়' ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ।

'অলখ নিরঞ্জন'—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্ঝন্।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল, 'অলখ নিরঞ্জন!'

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ—
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর এসেছে সে এক দিন॥

দিল্লিপ্রাসাদ কূটে
হোথা বার বার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে, নিবিড় নিশীথ টুটে—
কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে?

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কি রে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষীসমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো পঞ্চনদীর তীরে॥

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ-সনে।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখ-বীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল 'দীন্ দীন্' গরজনে॥

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লিনগর-'পরে।
বন্দা সময়ে বন্দী হইল গুরুদাসপুর গড়ে॥

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য উড়ায়ে পথের ধূলি
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া বর্শাফলকে তুলি—
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে, বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ-'পরে লোক নাহি ধরে, বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় 'গুরুজীর জয়' পরানের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে দিল্লিপথের ধূলি॥

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজীর' কহি শত বীর শত শির দেয় ডারি॥

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি বন্দার এক ছেলে—
কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে নিজ হাতে অবহেলে।'
দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার, বন্দার এক ছেলে॥

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার রাঙা উষ্ণীষখানি।
তার পরে ধীরে কটিবাস হতে ছুরিকা খসায়ে আনি

বালকের মুখ চাহি
'গুরুজীর জয়' কানে-কানে কয়, 'রে পুত্র, ভয় নাহি
নবীন বদনে অভয়কিরণ জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল, বালক উঠিল গাহি
'গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়' বন্দার মুখ চাহি ॥

বন্দা তখন বামবাহুপাশ জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণকরে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে—
'গুরুজীর জয়' কহিয়া বালক লুটালো ধরণীতলে ॥

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি' একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হল নিস্তব্ধ ॥

৩০ আশ্বিন ১৩০৬

হোরিখেলা

রাজস্থান

পত্র দিল পাঠান কেসর-খাঁ'রে
কেতুন হতে ভূনাগ রাজার রানী,
'লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া—
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানি।'
যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি
কেতুন হতে পত্র দিল রানী ॥

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি,
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।

রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে,
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে,
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান-সাথে হোরি খেলবে রানী—
কেসর হাসি গোঁফে দিল চাড়া॥

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আম্রবনে-বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে—
গুন্‌গুনিয়ে আপন-মনে-মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতুনপুরে দলে দলে আজি
পাঠান সেনা হোরি খেলতে এল॥

কেতুনপুরে রাজার উপবনে
তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি,
মূলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি,
এল তখন একশো রানীর দাসী
রাজপুতানি করতে হোরিখেলা।
রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা॥

পায়ে পায়ে ঘাগ্‌রা উঠে দুলে,
ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।
ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি,

বামহস্তে গুলাব-ভরা ঝারি—
সারি সারি রাজপুতানি আসে।
পায়ে পায়ে ঘাগ্‌রা উঠে দুলে,
ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে
কেসর তবে কহে কাছে আসি—
'বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি,
আজকে বুঝি জানে-প্রাণে মরি।'
শুনে রাজার শতেক সহচরী
হঠাৎ সবে উঠল অট্টহাসি।
রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেসর-খাঁ
রঙ্গভরে সেলাম করে আসি।

শুরু হল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরন ধরল বকুলফুলে,
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে
রাজপুতানির উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর-খাঁ—
বক্ষ কেন উঠছে নাকো দুলি,
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি
কেমন যেন বলছে বেসুর বুলি,
তেমন করে কাঁকন বাজছে না।

চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর-খাঁ ॥

পাঠান কহে রাজপুতানির দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা ?
বাহুযুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত,
বড়ো কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরিহীন মরুভূমির লতা !
পাঠান ভাবে, দেহে কিম্বা মনে
রাজপুতানির নাইকো কোমলতা ॥

তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠল দ্রুত তালে ।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা,
দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা
রানী বনে এলেন হেনকালে ।
তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে ॥

কেসর কহে, 'তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা ।'
রানী কহে, 'আমারো সেই দশা ।'
একশো সখী হাসিয়া বিবশা—
পাঠানপতির ললাটে সহসা
মারেন রানী কাঁসার থালাখানা ।
রক্তধারা গড়িয়ে প'ড়ে বেগে
পাঠানপতির চক্ষু হল কানা ॥

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর স্বরে ধরল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরুতলে-তলে
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া॥

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগ্‌রা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হল নারীসজ্জা ছেড়ে,
এক শত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে একশো সাপের মতো।
স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগ্‌রা ছিল যত॥

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
কেসর-খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা॥

পণরক্ষা

'মরাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ, করো করো সবে সাজ'
আজমির গড়ে কহিলা হাঁকিয়া দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দুপহরে যে যাহার ঘরে সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া দক্ষিণে বহুদূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা মরাঠি অশ্বখুরে।
'মরাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন' গর্জিলা দুমরাজ॥

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে, 'বৃথা এ সৈন্যসাজ।
হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র দুর্গেশ দুমরাজ!
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার ফিরিঙ্গি সেনাপতি—
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ, আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ বিজয়সিংহ-'পরে,
বিনা সংগ্রামে আজমির গড় দিবে মরাঠার করে।'
'প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে বিরোধ বাধিল আজ'
নিঃশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে দুর্গেশ দুমরাজ॥

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা, 'ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।'
রহিল পাষাণমুরতি-সমান দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায় যায়, ধূ ধূ করে মাঠ, দূরে দূরে চরে ধেনু—
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু।
'আজমির গড় দিলা যবে মোরে পণ করিলাম মনে
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায় ভাঙিতে হবে কি আজ!'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস দুর্গেশ দুমরাজ॥

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে ছাড়িল সমরসাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম-মাঠ-পারে,
মরাঠা সৈন্য ধুলা উড়াইয়া থামিল দুর্গদ্বারে।
'দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান— ওঠো ওঠো, খোলো দ্বার।'
নাহি শোনে কেহ; প্রাণহীন দেহ সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ দুর্গেশ দুমরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

নরকবাস

নেপথ্যে। কোথা যাও মহারাজ?

সোমক। কে ডাকে আমারে
দেবদূত? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে
দেখিতে না পাই কিছু— হেথা ক্ষণকাল
রাখো তব স্বর্গরথ।

নেপথ্যে। ওগো নরপাল,
নেমে এসো, নেমে এসো হে স্বর্গপথিক!

সোমক। কে তুমি, কোথায় আছ?

নেপথ্যে। আমি সে ঋত্বিক্
মর্তে তব ছিনু পুরোহিত।

সোমক। ভগবন্,
নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা-অন্ধকারলোক;
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন-মতন
নভস্তল— হেথা কেন তব আগমন?

প্রেতগণ। স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়; স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি; সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান, কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

ঋত্বিক্। মহারাজ, নামো
তব দেবরথ হতে।

প্রেতগণ। ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগাদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির তৃণের গন্ধ ফুলের পাতার—
শিশুর নারীর, হায়, বন্ধুর ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি। ছয়টি ঋতুর
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।

সোমক। গুরুদেব, প্রভো,
এ নরকে কেন তব বাস?

ঋত্বিক্। পুত্রে তব
যজ্ঞে দিয়েছিনু বলি— সে পাপে এ গতি
মহারাজ!

প্রেতগণ। কহো সে কাহিনী, নরপতি,
পৃথিবীর কথা পাতকের ইতিহাস
এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক উল্লাস।

রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্তরাগিণীর
সকল মূর্ছনা, সুখদুঃখকাহিনীর
করুণ কম্পন। কহো তব বিবরণ
মানবভাষায়।

সোমক। হে ছায়াশরীরীগণ,
সোমক আমার নাম, বিদেহভূপতি।
বহু বর্ষ আরাধিয়া দেব দ্বিজ যতী,
বহু যাগযজ্ঞ করি প্রাচীন বয়সে
এক পুত্র লভেছিনু ; তারি স্নেহবশে
রাত্রিদিন আছিলাম আপনাবিস্মৃত
সমস্ত-সংসারসিন্ধু-মথিত অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি
একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে জীবন মোর। আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখ'পরে, সূর্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেইমত রেখেছিনু তারে। সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম রাজধর্ম স্নেহ-পানে মোর
চাহিত সরোষ চক্ষে ; দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।

সভা-মাঝে
একদা অমাত্য-সাথে ছিনু রাজকাজে,
হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন
পশিল আমার কর্ণে। ত্যজি সিংহাসন
দ্রুত ছুটে চলে গেনু ফেলি সর্ব কাজ।

ঋত্বিক্। সে মুহূর্তে প্রবেশিনু রাজসভা-মাঝ

আশিস করিতে নৃপে, ধান্যদূর্বা করে,
আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া
ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল-পরে
ফিরিয়া আসিলা রাজা লজ্জিত-অন্তরে।
আমি শুধালেম তাঁরে, 'কহো হে রাজন্,
কী মহা অনর্থপাত দুর্দৈবঘটন
ঘটেছিল, যার লাগি ব্রাহ্মণেরে ঠেলি
অন্ধ অবজ্ঞার বশে, রাজকর্ম ফেলি,
না শুনি বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত
আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত
রাজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ,
সামন্ত রাজন্যগণে না দিয়া আসন,
প্রধান অমাত্য-সবে রাজ্যের বারতা
না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা
অতিথি সজ্জন গুণীজনে— অসময়ে
ছুটি গেলা অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হয়ে,
শিশুর ক্রন্দন শুনি; ধিক্ মহারাজ,
লজ্জায় আনতশির ক্ষত্রিয়সমাজ
তব মুগ্ধ ব্যবহারে; শিশুভুজপাশে
বন্দী হয়ে আছ পড়ি দেখে সবে হাসে
শত্রুদল দেশে দেশে! নীরব সংকোচে
বন্ধুগণ সংগোপনে অশ্রুজল মোছে।'

সোমক। ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি
অবাক হইল সভা। পাত্রমিত্র গুণী
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে
আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে

ভীত কৌতূহলে। রোষাবেশ ক্ষণতরে
উত্তপ্ত করিল রক্ত ; মুহূর্তেক-পরে
লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষসর্প-শিরে। করি প্রণিপাত
গুরুপদে কহিলাম বিনম্র বিনয়ে—
'ভগবন্, শান্তি নাই এক পুত্র লয়ে ;
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল। মোহবশে তাই
অপরাধী হইয়াছি ; ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
সাক্ষী থাকো মন্ত্রী সবে, হে রাজন্যগণ,
রাজার কর্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন
খর্ব করিব না আর ক্ষত্রিয়গৌরব।'

ঋত্বিক্। কুণ্ঠিত আনন্দে সভা রহিল নীরব।
আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
অন্তরে পোষণ করি, 'এক-পুত্র-শাপ
দূর করিবারে চাও— পন্থা আছে তারো—
কিন্তু সে কঠিন কাজ, পারো কি না পারো
ভয় করি।' শুনিয়া সগর্বে মহারাজ
কহিলেন, 'নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয়তনয়,
কহিলাম স্পর্শি তব পাদপদ্মদ্বয়।'
শুনিয়া কহিনু মৃদু হাসি, 'হে রাজন্,
শুন তবে। আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান।
তারি মেদগন্ধধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী
কহিনু নিশ্চয়।' শুনি নীরব নৃপতি
রহিলেন নতশিরে। সভাসুদ্ধ সকলে
উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে।

কর্ণে হস্ত রুধি কহে যত বিপ্রগণ—
'ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব।' নৃপতি তখন
কহিলেন ধীরস্বরে, 'তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু।'
তখন নারীর আর্ত বিলাপে চৌদিক
কাঁদি উঠে; প্রজাগণ করে ধিক্ ধিক্;
বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে। নৃপ শুধু রহিলা অটল।
জ্বলিল যজ্ঞের বহ্নি। যজনসময়ে
কেহ নাই— কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হতে বহি? রাজভৃত্য-সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে
মন্ত্রীগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল;
অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল।
আমি ছিন্নমোহপাশ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞানী,
হৃদয়বন্ধন সব মিথ্যা বলে মানি—
প্রবেশিনু অন্তঃপুরমাঝে। মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন
রেখেছেন অতি যত্নে বালকেরে ঘেরি
কাতর উৎকণ্ঠাভরে। শিশু মোরে হেরি
হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি;
জানাইল অর্ধস্ফুট কাকলি আকুলি—
'মাতৃব্যূহ ভেদ ক'রে নিয়ে যাও মোরে।'
বহুক্ষণ বন্দী থাকি খেলাবার তরে
ব্যগ্র তার শিশুহিয়া। কহিলাম হাসি—
'মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি,
আয় মোর সাথে।' এত বলি বল করি
মাতৃগণ-অঙ্ক হতে লইলাম হরি

সুহাস্য শিশুরে। পায়ে পড়ি দেবীগণ
পথ রুধি আর্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন—
আমি চলে এনু বেগে। বহ্নি উঠে জ্বলি ;
দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণপুত্তলি।
কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে
কলহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে
ঝাঁপাইতে চাহে শিশু। অন্তঃপুর হতে
শত কণ্ঠে উঠে আর্তস্বর। রাজপথে
অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ
নগর ছাড়িয়া। কহিলাম, 'হে রাজন্,
আমি করি মন্ত্রপাঠ ; তুমি এরে লও,
দাও অগ্নিদেবে।'

সোমক। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,
কহিয়ো না আর।

প্রেতগণ। থামো থামো, ধিক্ ধিক্।
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক্,
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি! খুঁজে যমলোক
তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।

দেবদূত। মহারাজ, এ নরকে ক্ষণকাল যাপি
নিষ্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণা?
উঠ স্বর্গরথে— থাক্ বৃথা আলোচনা
নিদারুণ ঘটনার।

সোমক। রথ যাও লয়ে
দেবদূত! নাহি যাব বৈকুণ্ঠ-আলয়ে।
তব সাথে মোর গতি নরকমাঝারে
হে ব্রাহ্মণ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন

নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুকসমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপজ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ— এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।
হায় পুত্র, হায় বৎস নবনীনির্মল,
করুণ কোমল কান্ত, হা মাতৃবৎসল,
একান্তনির্ভরপর, পরম দুর্বল
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃঅভিমানী
অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি
ধরিলি দুহাত মেলি বিশ্বাসে নির্ভয়ে।
তার পরে কী ভর্ৎসনা ব্যথিত বিস্ময়ে
ফুটিল কাতর চক্ষে বহ্নিশিখাতলে
অকস্মাৎ। হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তরতাপ! আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার—
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান! দগ্ধ হব আমি
নরক-অনল-মাঝে নিত্য দিনযামী,
তবু বৎস, তোর সেই নিমেষের ব্যথা
আচম্বিত বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃমুখ-পানে চেয়ে, পরম বিশ্বাস
চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস—
তার নাহি হবে পরিশোধ।

ধর্মের প্রবেশ

ধর্ম। মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ,
চলো ত্বরা করি।

সোমক। সেথা মোর নাহি স্থান
ধর্মরাজ! বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে।

ধর্ম। করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তরনরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্তপরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

ঋত্বিক্‌। যেয়ো না, যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ! সর্পশীর্ষতীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না, যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ—
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহো রহো,
মহারাজ, রহো হেথা।

সোমক। রব তব সহ
হে দুর্ভাগা! তুমি আমি মিলি অহরহ
করিব দারুণ হোম সুদীর্ঘ যজন
বিরাট নরকহুতাশনে। ভগবন্‌,
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে করো মোরে যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

ধর্ম। মহান্ গৌরবে হেথা রহো মহীপতি!
ভালের তিলক হোক দুঃসহদহন;
নরকাগ্নি হোক তব স্বর্ণসিংহাসন।

প্রেতগণ। জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী!
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহাবৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।
বোসো আসি দীর্ঘযুগ মহাশত্রু-সনে
প্রিয়তম মিত্র-সম এক দুঃখাসনে।
অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জলন্ত মেঘের সাথে দীপ্তসূর্যপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূরতি
নিত্যকাল-উদ্ভাসিত অনির্বাণ জ্যোতি॥

৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৪

গান্ধারীর আবেদন

দুর্যোধন। প্রণমি চরণে তাত!

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়,
অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ!

দুর্যোধন। লভিয়াছি জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। এখন হয়েছ সুখী!

দুর্যোধন। হয়েছি বিজয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই
রে দুর্মতি?

দুর্যোধন। সুখ চাহি নাই মহারাজ—
জয়! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি! দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা

জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান— সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুখে ছিনু যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে,
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীবটঙ্কারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে;
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তার— নিত্যনব ভোগসুখে
আছিনু নিশ্চিন্তচিত্তে অনন্ত কৌতুকে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরবকর্ণ প্রতিধ্বনিরবে,
পাণ্ডবের যশোবিম্ব-প্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু, পিতঃ,
আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত
পাণ্ডবগৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে,
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি— আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ।
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ,
সে কি ভুলে গেলি?

দুর্যোধন। ভুলিতে পারি নে সে যে—
এক পিতামহ, তবু ধনে মানে তেজে

এক নহি। যদি হ'ত দূরবর্তী পর,
নাহি ছিল ক্ষোভ। শর্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে—
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়শিখরে
দুই ভ্রাতৃ-সূর্যলোক কিছুতে না ধরে।
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ঈর্ষা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী!

দুর্যোধন। ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান; লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে—
এক সূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল, আজি কুরুসূর্য একা—
আজি আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্যোধন। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ!
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায় সুহৃদ্ রূপে নির্ভর বন্ধন।
কিন্তু রাজা একেশ্বর; সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্রজনে
বলভাগ ক'রে লয়ে বান্ধবের সনে

রহে বলী ; রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন-'পরে বহু দূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার ?
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে ; মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি—
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি
পাণ্ডবগৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র। জিনিয়া কপট দ্যূতে তারে কোস জয় ?
লজ্জাহীন অহংকারী !

দুর্যোধন। যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল
ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিকো সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায় ? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু-মাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে। জয়লাভ এক লক্ষ্য তার।
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি তুমি জয়ী, তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্যোধন। নিন্দা ! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।

নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে। দুর্যোধন পাপী,
দুর্যোধন ক্রূরমনা, দুর্যোধন হীন—
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন;
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ—
দুর্যোধন রাজা, দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম।

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে বৎস, শোন্,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে; দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

দুর্যোধন। অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়;
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ! প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—
সে প্রীতি বিলাক্ তারা পালিত মার্জারে,

দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডবভ্রাতারে—
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য— আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি। শুন নিবেদন
পিতৃদেব— এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে
কণ্টকতরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান ;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্যগুণগান,
আমাদের নিত্যনিন্দা। এইমতে, পিতঃ,
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চিরনির্বাসিত।
এইমতে, পিতঃ, মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল ; উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত ; পাণ্ডবেরা স্ফীত,
অখণ্ড, অবাধগতি। অন্ত হতে, পিতঃ,
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্মপিতামহে— যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু-উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তি-মাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব— নাহি কাজ
সিংহাসনকণ্টকশয়নে— মহারাজ,

বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় বৎস অভিমানী, পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য— হইত কল্যাণ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে—
তবু, পুত্র, দোষ দিস স্নেহ নাই বলে?
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি।— অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন, তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি; বন্ধুগণ হাহাকাররবে
করিছে নিষেধ; নিশাচর গৃধ্রসবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার; পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ; আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর; তবু দৃঢ় করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে। শুধু তুমি আর আমি,
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের। সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা

মুহূর্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়—
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গন কোরো না শিথিল ; ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।— ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্‌ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে ;
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা-লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম— শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

চরের প্রবেশ

চর। মহারাজ, অগ্নিহোত্র দেব-উপাসনা
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা,
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া। পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব ; সন্ধ্যা হল তবু
ভৈরবমন্দির-মাঝে নাহি বাজে, প্রভু,
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে।
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার-পানে
দীনবেশে সজলনয়নে।

দুর্যোধন। নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন,
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।

রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা— নির্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্যোধন। পিতঃ, আমি চলিলাম তবে। প্রস্থান

ধৃতরাষ্ট্র। করো পলায়ন। হায়, কেমনে বা সবে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত! মোরে তোর নাহি লাজ।

গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা করো নাথ!

ধৃতরাষ্ট্র। কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা!

গান্ধারী। ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র। কারে হে মহিষী!

গান্ধারী। পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শাণ ধর্মের কৃপাণে,
সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে সে জন? আছে কোন্‌খানে?
শুধু কহো নাম তার।

গান্ধারী। পুত্র দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। তাহারে করিব ত্যাগ ?

গান্ধারী। এই নিবেদন

তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। দারুণ প্রার্থনা, হে গান্ধারী

রাজমাতা !

গান্ধারী। এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি

হে কৌরব ? কুরুকুলপিতৃপিতামহ

স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ

নরনাথ ! ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে·

কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে

অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ

রাত্রিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম তারে করিবে শাসন

ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে— আমি পিতা–

গান্ধারী। মাতা আমি নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা

জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?

স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে

উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি

তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ?

শাখাবন্ধে ফল যথা, সেইমত করি

বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি

দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে— লয়ে টানি

মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,

প্রাণ হতে প্রাণ ? তবু কহি মহারাজ,

সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।

ধৃতরাষ্ট্র। কী রাখিব তারে ত্যাগ করি ?

গান্ধারী। ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র। কী দিবে তোমারে ধর্ম ?

গান্ধারী। দুঃখ নবনব।
পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া!

ধৃতরাষ্ট্র। হায় প্রিয়ে,
ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর, 'কী করিলি ওরে!
এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী-'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে—
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্বল দ্বিধায় পড়ি! অপমানক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে— শুধু নব কাষ্ঠভার
হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।
সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া—
করহ দলন। কোরো না বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত; যদি ডেকে আন তারে
বরণ করিয়া তবে লহো একেবারে।'
এইমত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণসূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে; দ্যূতছলনায়

বিসর্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম!
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ! কে বুঝিবে মর্ম
সংসারের!

গান্ধারী। ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু;
ধর্মেই ধর্মের শেষ। মূঢ় নারী আমি,
ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী,
জান তো সকলি। পাণ্ডবেরা যাবে বনে,
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে—
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি! পুত্রে তব ত্যজ এইবার—
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না। ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ
পৌরবপ্রাসাদ হতে। দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে, ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় মহারানী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী!

গান্ধারী। অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে—
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর

রয়েছে উদ্যত নিত্য ; অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

গান্ধারী। তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত ; ধর্মরক্ষা কাজ
তোমা-'পরে সমর্পিত।— শুধাই তোমারে,
যদি কোনো প্রজা তব, সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে— কী তাহার করিবে বিধান ?

ধৃতরাষ্ট্র। নির্বাসন।

গান্ধারী। তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু ! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ ; ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার ; দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত— পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে ! বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে ; মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে— পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ-'পরে
কলুষপরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ— পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ

যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ—
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তার বিধান! অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে
সেও সহে। কিন্তু, প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে। হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদপাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা ঘৃণা করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খলখল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র-পিশাচেরা— ধর্ম জানে,
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত!
তোমরা, হে মহারথী, জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে;
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি— কোষ-মাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্রনিঃশেষিত লুপ্তবিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত— মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ;
বীরধর্ম করহ উদ্ধার; পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন; অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান— ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। পরিতাপদহনে জর্জর

হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী !

গান্ধারী। শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে ? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পারো না দিতে সে কারে দিয়ো না ;
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক ! শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ—ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে—
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,

তাই তারে ত্যজিতে না পারি— আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ততরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ, তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব? উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি—
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে, অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধফল ভোগ করি তার দুর্মতির—
সেই তো সান্ত্বনা মোর। এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ— ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে। প্রস্থান

গান্ধারী। হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু— জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল— সেইমত কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি

দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার— তখন সুধীরে
ধুলায় পড়িস লুটি অবনতশিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক্ নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নিবৃত্তি—
শ্মশানের-ভস্ম-মাখা পরমা নিষ্কৃতি।

দুর্যোধনমহিষী ভানুমতীর প্রবেশ

দাসীগণের প্রতি

ভানুমতী। ইন্দুমুখি! পরভৃতে! লহো তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলংকার।

গান্ধারী। বৎসে, ধীরে! ধীরে!
পৌরবভবনে কোন্ মহোৎসব আজি!
কোথা যাও নব বস্ত্র-অলংকারে সাজি
বধূ মোর?

ভানুমতী। শত্রুপরাভবশুভক্ষণ
সমাগত।

গান্ধারী। শত্রু যার আত্মীয়স্বজন
আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম শত্রু তার,
অজেয় তাহার শত্রু। নব অলংকার
কোথা হতে হে কল্যাণী?

ভানুমতী। জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলংকার,
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহংকার
ঠিকরিত মাণিক্যের শত সূচীমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে, বিদ্ধ হত বুকে
কুরুকুলকামিনীর, সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

গান্ধারী। হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার—
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার!
একি ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
যুগান্তের উল্কা -সম দহিছে না আজ
এ মণিমঞ্জীর তোরে? রত্নললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে, চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডবঝংকার।

ভানুমতী। মাতঃ, মোরা ক্ষত্রনারী, দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়—
মধ্যাহ্নগগনে কভু, কভু অস্তধামে,
ক্ষত্রিয়মহিমাসূর্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি

শস্তার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডরি
ক্ষণকাল। দুর্দিন দুর্যোগ যদি আসে
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী,
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

গান্ধারী। বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে। লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীররক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি— রত্ন-অলংকার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতাকুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে। বৎসে, ভাঙিয়ো না বদ্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিপ্লবের কেতু
গৃহ-মাঝে। আনন্দের দিন নহে আজি।
স্বজনদুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব করিয়ো না মাতঃ! হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ; বেণী করি উন্মোচন
শান্ত মনে করো, বৎসে, দেবতা-অর্চন।
এ পাপসৌভাগ্যদিনে গর্ব-অহংকারে
প্রতিক্ষণে লজ্জা দিয়ো নাকো বিধাতারে।
খুলে ফেলো অলংকার, নব রক্তাম্বর;
থামাও উৎসববাদ্য, রাজ-আড়ম্বর;
অগ্নিগৃহে যাও পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে—
কালের প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব-চিতে।

ভানুমতীর প্রস্থান

দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি, জননী,
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী। সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জল
উদিবে হে বৎসগণ! বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ দুঃখব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্য-মাঝে গুপ্ত থাকি দীন ছদ্মরূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব; সদা চুপে চুপে
দুঃখ হতে তোমা-তরে করুন সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ। নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসনবাস। বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জলন্ত তেজ করুক সংযোগ—
বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজ বিধি; যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে!
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ! অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।

দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন-পূর্বক

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী, একবার

তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান।
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য— কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সর্ব কুলাঙ্গনা—
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।
যাও বৎসে, পতি-সাথে অমলিনমুখ,
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভ সার্থকতা।
রাজগৃহে আয়োজন দিবসযামিনী
সহস্র সুখের; বনে তুমি একাকিনী
সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা, সকল আশ্রয়,
ক্লান্তির আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা
উষা মূর্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে॥

[৭ মাঘ ১৩০৪]

কর্ণকুন্তীসংবাদ

কর্ণ। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি— কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ!

কুন্তী। বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে,
সেই আমি আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

কর্ণ। দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ-'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে,
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে
তোমা-সাথে হে অপরিচিতা!

কুন্তী। ধৈর্য ধর্,
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে— কহি তোরে, বীর,
কুন্তী আমি।

কর্ণ। তুমি কুন্তী! অর্জুনজননী!

কুন্তী। অর্জুনজননী বটে, তাই মনে গণি
দ্বেষ করিয়ো না বৎস! আজো মনে পড়ে
অস্ত্রপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে।
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে? কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিসচুম্বন?

অর্জুনজননী সে যে। যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
কহিলেন 'রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিনী? অর্জুনজননী সে যে।
পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক-সাথে। হেনকালে করি পথ
রঙ্গ-মাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারি দিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল। সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে, ওগো বীরমণি,
আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্যে! রাজমাতা তুমি
কেন হেথা একাকিনী? এ যে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে!

আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ। কোথা লবে মোরে?

কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে, লব মাতৃক্রোড়ে।

কর্ণ। পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী—
আমি কুলশীলহীন, ক্ষুদ্র নরপতি,
মোরে কোথা দিবে স্থান?

কুন্তী। সর্ব উচ্চভাগে,
তোমারে বসাব মোর সর্বপুত্র আগে—
জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি।

কর্ণ। কোন্ অধিকারমদে
প্রবেশ করিব সেথা? সাম্রাজ্যসম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহো মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী। পুত্র মোর ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন— সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে,
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

কর্ণ। শুনি স্বপ্নসম,
হে দেবী, তোমার বাণী। হেরো, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে

কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যূষে! পুরাতন সত্য-সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী,
তোমার দক্ষিণহস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়;
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়,
'জননী গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ।'
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি। সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডবজননী-রূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে!
হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুনজননীকণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর! মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া— চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই বলে ধায়!

কুন্তী। তবে চলে আয় বৎস, তবে চলে আয়।

কর্ণ। যাব মাতঃ, চলে যাব— কিছু শুধাব না—
না করি সংশয় কিছু না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা। তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে। নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরি জয়শঙ্খ। মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কুন্তী। ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে।

কর্ণ। হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবী, কহো আরবার,
আমি পুত্র তব।

কুন্তী। পুত্র মোর!

কর্ণ। কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে—
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে?
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে,
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে। মাতঃ, নিরুত্তর?
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর

পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু— থাক্ থাক্ তবে।
কহিয়ো না কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ,
সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহো মোরে,
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

কুন্তী। হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম
শতখণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে,
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন; তবু হায়,
তোরই লাগি বিশ্ব-মাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা। যবে মুখে তোর
একটি ফুটে নি বাণী, তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি— বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল—
পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক নির্মল।—

কর্ণ। মাতঃ, দেহো পদধূলি, দেহো পদধূলি,
লহো অশ্রু মোর।

কুন্তী। তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায়, পুত্র, আসি নাই দ্বারে।

ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান—
দূর করি দিয়া, বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চভ্রাতা।

কর্ণ। মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্‌, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী। রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো, হে বৎস, উদ্ধার।
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র। তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্য-মাঝে রত্নসিংহাসনে।

কর্ণ। সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই, মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে—
তবে ধিক্‌ মোরে।

কুন্তী। বীর তুমি, পুত্র মোর,

ধন্য তুমি!— হায় ধর্ম, একি সুকঠোর
দণ্ড তব! সেইদিন কে জানিত, হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে!
একি অভিশাপ!

কর্ণ। মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম— হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

১৫ ফাল্গুন ১৩০৬

উদ্‌বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে—
তাহাদেরই গান গা রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে॥

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর, বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ বহি নিমেষের কাহিনী॥

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাহি না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে তারি গহ্বর পুরাতে।
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে॥

ওরে, থাক্‌ থাক্‌ কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে নিজ-হাতে-বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি— ওরে, থাক্‌ থাক্‌ কাঁদনি॥

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর 'পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে॥

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায় বিদ্যেরত্ন-পাড়ায়,
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,
চলছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক সদাই দিবারাত্র
পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র,
পুঁথিপত্র মেলাই আছে মোহধ্বান্তনাশন—
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে পেতে চাস কি আসন?
গান তা শুনি গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান?
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চহাজার গ্রন্থ—
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিতমধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা;
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে যত্ন পুরামাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী, সেথায় করবি যাত্রা?

গান তা শুনি কর্ণমূলে মর্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান ?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে এক্‌জামিনের পড়ায়,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন্ দিকে যে গড়ায়,
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা,
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা ;
সেইখানেতে ছেঁড়াছড়া এলোমেলোর মেলা
তারি মধ্যে, ওরে চপল, করবি কি তুই খেলা ?
গান তা শুনে মৌনমুখে রহে দ্বিধার ভরে—
যাব-যাব করে ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মীবধূ যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে,
বালিশ-তলে বইটি চাপা, টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে—
কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা চুলের-গন্ধে-ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্নবেশে চাস কি যেতে ত্বরা ?
বুকের 'পরে নিশ্বসিয়া স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান ।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ ?
যেথায় সুখে তরুণযুগল পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়,

পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায় পুষ্প লতা পাতা ;
সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে ?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া কহে আমার গান—
'সেইখানে মোর স্থান' ॥

কবির বয়স

ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক—
বসে বসে ঊর্ধ্ব-পানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক ?
কবি কহে, সন্ধ্যা হল বটে,
শুনছি বসে লয়ে শ্রান্ত দেহ,
এ পারে ওই পল্লী হতে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হোথায় বকুল-বনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সংগীতে—
কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো-মন্দই গণি ?।

সন্ধ্যাতারা উঠে অস্তে গেল,
চিতা নিবে এল নদীর ধারে,

কৃষ্ণপক্ষে হলুদ্‌বর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে,
শৃগালসভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে—
এমন কালে কোনো গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
জোড়হস্তে ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্তঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে—
ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে ?।

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সি জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে,
কেউ-বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে
জগৎ-মাঝে কেউ-বা হাঁকায় রথ,
কেউ-বা মরে একলা ঘরের শোকে
জনারণ্যে কেউ-বা হারায় পথ—

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন্ শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমানবয়সি যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক ॥

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে, সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
জীবন-তরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে ॥

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইকো মৃত্যু জরা।
ছ'টা ঋতু পূর্ণ ক'রে ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্তা তাহার রইত কাব্যে গাঁথা।
বিরহদুখ দীর্ঘ হত, তপ্ত অশ্রুনদীর মতো
মন্দগতি চলত রচি দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো একটুমাত্র ত্বরা ॥

অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হ'ত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে !
প্রিয়সখীর নামগুলি সব ছন্দ ভরি করিত রব
রেবার কূলে কলহংসকলধ্বনির মতো।

কোনো নামটি মন্দালিকা, কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী ঝংকারিত কত।
আসত তারা কুঞ্জবনে চৈত্রজ্যোৎস্নারাতে,
অশোক-শাখা উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে॥

কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁওয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে॥

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায় বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে দিন গণিত বসে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে পড়ত খসে খসে।
মিলন-রাতে বাজত পায়ে নূপুরদুটি বাঁকা,
কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায় বক্ষ রইত ঢাকা॥

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে দিত ময়ূরটিরে কঙ্কণঝংকারে।
কপোতটিরে লয়ে বুকে সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী কথা কইত শৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধরে 'হলা পিয় সহি'।

জল সেচিত আলবালে তরুণ সহকারে
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের শারিকারে ॥

নবরত্নের সভার মাঝে রইতাম একটি টেরে,
দূর হইতে গড় করিতাম দিঙ্‌নাগাচার্যেরে।
আশা করি নামটা হত   ওরই মধ্যে ভদ্রমত,
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত কিম্বা বসুভূতি।
স্রগ্ধরা কি মালিনীতে   বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি ছোটোখাটো পুঁথি।
ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি শ্লোক-রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে রইতাম একটি টেরে ॥

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্‌ মালবিকার জালে।
কোন্‌ বসন্তমহোৎসবে   বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে
কোন্‌ ফাগুনের শুক্লনিশায়   যৌবনেরই নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।
ছল ক'রে তার বাধত আঁচল সহকারের ডালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে ॥

হায় রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।
হারিয়ে গেছে সে-সব অব্দ,   ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ—
গেছে যদি আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে, গেল সঙ্গে তারি   সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা মালবিকার দল।
কোন্‌ স্বর্গে নিয়ে গেল বরমাল্যের থাল!
হায় রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল ॥

যাদের সঙ্গে হয় নি মিলন সে-সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরই দুঃখে আমায় করছে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে তেমনি বকুল ফোটে গাছে
যদিও সে পায় না নারীর মুখমদের ছিটা—
ফাগুন-মাসে অশোক-ছায়ে অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু তেমনি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া অনেকটা সান্ত্বনা
যদিও রে নাইকো কোথাও সে-সব বরাঙ্গনা॥

এখন যাঁরা বর্তমানে আছেন মর্তলোকে
ভালোই লাগত তাঁদের ছবি কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতামোজা, চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা অন্যদেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।
মরব না, ভাই, নিপুণিকা চতুরিকার শোকে—
তাঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্তলোকে॥

আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।
দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি এই আধুনিক বিনোদিনী,
মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে, তোমার তরুণ আঁখির প্রসাদ যেচে যেচে
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে॥

জন্মান্তর

আমি   ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি   চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।
আমি   নাই-বা গেলাম বিলাত,
নাই-বা   পেলাম রাজার খিলাত—
যদি   পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল-বালক
তবে   নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক॥

যারা   নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে,
যারা   গুঞ্জাফুলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে,
যারা   বৃন্দাবনের বনে
সদাই   শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা   যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শীতল কালো জলে।
যারা   নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে॥

ওরে,   বিহান হল, জাগো রে ভাই— ডাকে পরস্পরে—
ওরে,   ওই-যে দধিমন্থধ্বনি উঠল ঘরে ঘরে।
হেরো   মাঠের পথে ধেনু
চলে   উড়িয়ে গোখুর-রেণু,
হেরো   আঙিনাতে ব্রজের বধূ দুগ্ধদোহন করে।
ওরে,   বিহান হল, জাগো রে ভাই— ডাকে পরস্পরে॥

ওরে,   শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে,
ওরে,   এপার ওপার আঁধার হল কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে   গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে   খেয়াতরীর 'পরে,
হেরো   কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর কলাপখানি তুলে।
ওরে,   শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে।

মোরা   নব-নবীন ফাগুন-রাতে নীলনদীর তীরে
কোথা   যাব চলি অশোক-বনে, শিখীপুচ্ছ শিরে!
যবে   দোলার ফুলরশি
দিবে   নীপশাখায় কষি,
যবে   দখিন-বায়ে বাঁশির ধ্বনি উঠবে আকাশ ঘিরে,
মোরা   রাখাল মিলে করব মেলা নীলনদীর তীরে॥

আমি   হব না, ভাই, নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি   জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি   ননীছানার গাঁয়ে
কোথাও   অশোক-নীপের ছায়ে
আমি   কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,
তবে   চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক॥

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার কহো আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের করব মহাজনি।
দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি ভিক্ষা নৈব নৈব।
যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু আর-কারে তো পাবই॥

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি, বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব দিয়ে কোন্ সাগরে পাড়ি!
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি   কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী অকূল কালোনীরে।

মরব না আর ব্যর্থ আশায় বালুমরুর তীরে।
যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু আর-কারে তো পাবই॥

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্ত নামে ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই, ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ-মনে রইব না আর কভু।
যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই!
তোমায় যদি না পাই তবু আর-কারে তো পাবই॥

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগনদী—
সোনার রেণু আনব ভরি সেথায় নামি যদি।
যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু আর-কারে তো পাবই॥

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নায়।
নব নব পবনভরে যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যত।
ভিখারি তোর ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো।
যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু আর-কারে তো পাবই।

সোজাসুজি

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে, নয়ন-পানে নয়ন ছোটে —
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা এইটুকু বৈ নয়কো মোটে।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্রমাসে হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে, তোমার কোলে ফুলের পুঁজি—
তোমার আমার এই-যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

বসন্তীরঙ বসনখানি নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া, একটু রাখা, একটু প্রকাশ, একটু ঢাকা,
একটু হাসি, একটু শরম— দুজনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই-যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

মধুমাসের মিলন-মাঝে মহান্ কোনো রহস্য নেই,
অসীম কোনো অবোধ কথা যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু ছায়ার মতো নাইকো কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজি নে, ভাই, ভাষাতীত।
আকাশ-পানে বাহু তুলে চাহি নে, ভাই, আশাতীত!
যেটুকু দিই যেটুকু পাই তাহার বেশি আর-কিছু নাই—
সুখের বক্ষ চেপে ধরে করি নে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

শুনেছিনু প্রেমের পাথার, নাইকো তাহার কোনো দিশা—
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে অসীম ক্ষুধা, অসীম তৃষা।
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি।
আমাদের এই দোঁহার মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

যাত্রী

আছে, আছে স্থান।
একা তুমি, তোমার শুধু একটি আঁটি ধান।
নাহয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি এমন-কিছু নয় সে বেশি—
নাহয় কিছু ভারী হবে আমার তরীখান—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি ? আছে, আছে স্থান॥

এসো, এসো নায়ে।
ধুলা যদি থাকে কিছু থাক্‌-না ধুলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা, চোখের কোণে চঞ্চলতা—
সজলনীল-জলদ-বরন বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই। এসো, এসো নায়ে॥

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা, কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেক-তরে বসবে আমার তরী-'পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে মানবে না মোর মানা।
এলে যদি তুমিও এসো। যাত্রী আছে নানা॥

কোথা তোমার স্থান ?
কোন্‌ গোলাতে রাখতে যাবে একটি আঁটি ধান ?
বলতে যদি না চাও তবে শুনে আমার কী ফল হবে,
ভাবব বসে খেয়া যখন করব অবসান—
কোন্‌ পাড়াতে যাবে তুমি, কোথা তোমার স্থান॥

এক গাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি,
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুইটি পাড়ায় বড়োই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধা ঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম-ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

আমাদের এই গ্রামের গলি-'পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শণ।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালী-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন, ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে॥

শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে॥

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথপাশে দেখ্‌ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে॥

[শিলাইদহ]
২০ জ্যৈষ্ঠ [১৩০৭]

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে॥

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে, গরজে
গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে॥

নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে
লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে॥

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী
এলায়ে?
ওগো, নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি,
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?
ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে?।

ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে কে ব'সে অমল বসনে, শ্যামল
বসনে?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়,
নবমালতীর কচি দলগুলি আনমনে কাটে দশনে।
ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে কে ব'সে শ্যামল বসনে?।

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল
দুলিছে?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক, কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে?।

বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে কে বেঁধেছে তার তরণী, তরুণ
তরণী?

রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদলরাগিণী সজলনয়নে গাহিছে পরানহরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে বেঁধেছে তরুণ তরণী॥

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে॥

শিলাইদহ
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস পসরা লয়ে—
সন্ধ্যা হল, ওই-যে বেলা গেল রে বয়ে।
যে যার বোঝা মাথার 'পরে ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী উঠল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি নদীর তীরে তীরে।
কিসের আশে ঊর্ধ্বশ্বাসে এমন সময়ে
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস পসরা লয়ে?।

সুপ্তি দিল বনের শিরে হস্ত বুলায়ে,
কা কা ধ্বনি থেমে গেল কাকের কুলায়ে।
বেড়ারধারে পুকুর পাড়ে ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে—
বাতাস ধীরে পড়ে এল, স্তব্ধ বাঁশের শাখা।

হেরো ঘরের আঙিনাতে শ্রান্তজনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে বিরাম-সুধা-মাখা।
সকল চেষ্টা শান্ত যখন এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস পসরা লয়ে ?।

[শিলাইদহ]
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, ছুটি নে কাহারও পিছুতে ;
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল খবর রাখি নে তো কোনো-কিছুরই ;
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে ;
তাই ব'লে কিছু কাড়াকাড়ি করে কাড়ি নে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি ;
বকি নে কারেও, শুনি নে কাহারও বকুনি ;
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের নাড়ি নে।

মন-দে'য়া-নে'য়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে ;
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে ;
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়শোণিত-বরনে।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি, মন ফেলে তাই ছুটেছি ;
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে জুটেছি।
বুক-ভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া ;
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ উঠেছি ॥

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত আগে পড়িত না নয়নে ;
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে।
মধুকরসম ছিনু সঞ্চয়প্রয়াসী,
কুসুমকান্তি দেখি নাই মধুপিয়াসি—
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে
ছিলাম যখন নিলীন বকুলশয়নে ॥

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি, মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি পিছুতে।
সবলে কারেও ধরি নে বাসনামুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে ;
যখন ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে ॥

বিলম্বিত

অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।
তখন ছিল দখিন হাওয়া আধ্‌ঘুমো আধ্‌জাগা,
তখন ছিল সর্ষেক্ষেতে ফুলের আগুন লাগা,
তখন আমি মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম রুদ্ধ কুটির থেকে।

অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে নবীন-সুধা-ঢালা?
আজকে বহে পুবে বাতাস, মেঘে আকাশ জুড়ে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে নব-নবাঙ্কুরে,
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইকো রে হায় হালকা সে হিল্লোল—
নাই বাগানে হাস্যে গানে পাগল গণ্ডগোল।
অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।

হল কাজের ভুল,
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম দখিন হাওয়ার ফুল।
এখন এল অন্য সুরে অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথো অন্য ফুলে অন্য ছাঁদের মালা।
বাজছে মেঘের গুরুগুরু, বাদল ঝরঝর,
সজল বায়ে কদম্ববন কাঁপছে থরথর।
অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।

[শিলাইদহ]
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়—
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায়।
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো, ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট—
পথের দু ধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায়।
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়।

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি না আছে তল,
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি উঠেছে জল।
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার
কথা বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে তাল-তলায়।
আজ ভোর হতে নাই গো বাদল, আয় গো আয়॥

ঘাটে পইঠায় বসিবি বিরলে ডুবায়ে গলা,
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি নূতন বলা।
সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি ক'রে ভেসে যাবে মেঘ আকাশগায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল, আয় গো আয়॥

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা,
খঞ্জনদুটি আলস্যভরে ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমিরনিবিড় ঘনঘোর ঘুমে স্বপনপ্রায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল, আয় গো আয়॥

মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল, আয় গো আয়—
আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল-'পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল, আয় গো আয়॥

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

চিরায়মানা

যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।
বেণী নাহয় এলিয়ে রবে, সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে,
নাই-বা হল পত্রলেখায় সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাহে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ॥

এসো দ্রুত চরণদুটি তৃণের 'পরে ফেলে।
ভয় কোরো না— অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক,
নূপুর যদি খুলে পড়ে নাহয় রেখে এলে।
খেদ কোরো না মালা হতে মুক্তা খসে গেলে।
এসো দ্রুত চরণদুটি তৃণের 'পরে ফেলে॥

হেরো গো ওই আঁধার হল, আকাশ ঢাকে মেঘে।
ও পার হতে দলে দলে বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে বাতাস ওঠে জেগে।
ওই রে গ্রামের গোষ্ঠমুখে ধেনুরা ধায় বেগে।
হেরো গো ওই আঁধার হল, আকাশ ঢাকে মেঘে॥

প্রদীপখানি নিবে যাবে, মিথ্যা কেন জ্বালো?
কে দেখতে পায় চোখের কাছে কাজল আছে কি না আছে,
তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে এমনি থাকা ভালো।
কাজল দিতে প্রদীপখানি মিথ্যা কেন জ্বালো?॥

এসো হেসে সহজ বেশে, আর কোরো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্বগগন, বেলা নাই রে আজ।
এসো হেসে সহজ বেশে, নাই-বা হল সাজ॥

শিলাইদহ। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন-মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন-দুটির মঙ্গলগীত উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি হাসে চোখের 'পরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

তোমার নাহি শীত বসন্ত, জরা কি যৌবন,
সর্বঋতু সর্ব কালে তোমার সিংহাসন।
নিভে নাকো প্রদীপ তব, পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি চির বিরাজ করে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

নদীর মতো এসেছিলে গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগর-পানে চল অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল তীর্থসলিল ঝরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল মুকুল খ'সে পড়ে—
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে॥

[শিলাইদহ]
২৮ জ্যৈষ্ঠ [১৩০৭]

অবিনয়

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে॥

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি উঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে মারিছে উঁকি!
বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি॥

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,
নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীনপাতা।
সজল পবন দিশে দিশে তুলে বাদলগাথা॥

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হতে পারে, করিয়ো ক্ষমা।
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারো নাহি কোনো কাজ —
জনহীন পথ, ধেনুহীন মাঠ যেন সে আঁকা।
বর্ষণঘন শীতল আঁধারে জগৎ ঢাকা॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার বরণডালা॥

[শিলাইদহ]
১ আষাঢ় [১৩০৭]

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।

আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে,
আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

এমনি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি ক'রে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি ক'রে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।

মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

[শিলাইদহ]
৪ আষাঢ় [১৩০৭]

আবির্ভাব

বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি নবঘন-বিপুলমন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে সে গান তোমার করো সায়-
আজি জলভরা বরষায়॥

দূরে একদিন দেখেছিনু তব কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ—
কোথা চম্পক-আভরণ॥

সেদিন দেখেছি, খনে খনে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
ছুয়ে ছুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে তব নিশ্বাসপরিমল—
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল॥

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া, গগনে ছড়ায়ে এলো চুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যামসমারোহে হৃদয়সাগর-উপকূল—
চরণে জড়ায়ে বনফুল॥

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখে নি সে গানের সুর এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার-
এ নহে তোমার উপহার॥

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি দূরে করি দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন।
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ,
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসরঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ্য বিরচন—
এ কি রূপে দিলে দরশন॥

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর আয়োজনহীন পরমাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ॥

আস নাই তুমি নবফাল্গুনে ছিনু যবে তব ভরসায়,
এসো এসো ভরা বরষায়।

এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি যে গান বাজাবে সে গান তোমার করো সায়-
আজি জলভরা বরষায় ॥

[শিলাইদহ]
১০ আষাঢ় [১৩০৭]

জনারণ্য

মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়— নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণভিত্তির 'পরে— চৌদিক আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—
তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি, কোলাহল-মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা-'পরে
যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা,
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।

স্তব্ধতা

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।
জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার

স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিতনয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত,
নিদ্রায় অলস, ক্লান্ত।

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

সফলতা

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি, কর্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।
নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে-সকল ক্ষণ—
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব! অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুট বর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে।
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণতগর্ভ। আমি নিদ্রাতুর
আলস্যশয্যার 'পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু সব কর্ম রহিল পড়িয়া।

প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন;
দেখিনু, ভরিয়া আছে আমার কানন।

প্রাণ

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

দেহলীলা

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।

একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্ত-দীপ-জ্বালা-
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা
একি শ্যাম বসুন্ধরা— সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরু-পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার! একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল

আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ !
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ ॥

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম, বিচিত্র, কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ ॥

মুক্তি

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ॥

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে ॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ॥

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া ॥

অজ্ঞাতে

তখন করি নি, নাথ, কোনো আয়োজন।
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের 'পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ! লই তুলি
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি—
দেখি তারা স্মৃতি-মাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত-না ধূলির সাথে, আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে।

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধুলাস্তূপ খেলাঘর দেখে।
খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি, আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসংগীতসাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।

অপরাহ্ণে

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি
তোমার প্রাঙ্গণতলে, ভরি লয়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীনশিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর
স্নিগ্ধ বনপথ দিয়ে। আমি অন্যমনে
সঘনপল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণীতীরে
বিহঙ্গের কলগীতে, সুমন্দ সমীরে।

আমি যাই নাই, দেব, তোমার পূজায়—

চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায়।
আজ ভাবি, ভালো হয়েছিল মোর ভুল—
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল॥

হেরো তারা সারা দিনে ফুটিতেছে আজি।
অপরাহ্ণে ভরিলাম এ পূজার সাজি॥

প্রতীক্ষা

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।
গণনা কেহ না করে; রাত্রি আর দিন
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।
বিলম্ব নাহিকো তব, নাহি তব ত্বরা—
প্রতীক্ষা করিতে জানো। শতবর্ষ ধ'রে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই
আমাদের হাতে; কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলি; দেরি কারো নাহি সহে কভু॥

আগে তাই সকলের সব সেবা, প্রভু,
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য পড়ে থাকে হায় তব পূজাথাল॥

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়—
এসে দেখি যায় নাই তোমার সময়॥

অপ্রমত্ত

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা

উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ॥

দাও ভক্তি, শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসারভবনদ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর— সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভচেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।

সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ, অমত্ত, গম্ভীর॥

দীক্ষা

আঘাতসংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে॥

করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে

সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥

ত্রাণ

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে॥

ন্যায়দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ!
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি

সবিনয়ে ; তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে ॥

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান ॥

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ॥

প্রার্থনা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

নীড় ও আকাশ

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে, নানা গন্ধে গীতে,
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিমসমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র— সেথা শুভ্র ভাস—
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।

জন্ম

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো।

তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুখে খচিত সংসার—

তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত, একান্তই মম ॥

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননীমুরতি ॥

মৃত্যু

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে ॥

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনমমুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে! মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয় ॥

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে ॥

নিবেদন

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন

দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর ! বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিতমুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।

বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

অতিথি

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে-যে খুলি দ্বার,
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে—
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।

ততকাল আমি একা বসি রব খুলি দ্বার,
কাজ করি লব শেষ।
দিন হবে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ।

পূজা-আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হয়ে রব—
নীরবে বাড়ায়ে বাহুদুটি, সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি লব ॥
যে জন আজিকে ছেড়ে চলে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
'মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।'
সেই বলে গেল, 'গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি—
নব গৃহমাঝে বহি এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি।'

[১৩০৯]

প্রতিনিধি

ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড়ো সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে জেনেছিলে খুশি হতে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা ॥

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক, সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া ॥
তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা-একা দেখি দুজনের দেখা,

তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি।

এই-যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে,
তোমার আমার মন খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে
এই শীতমধ্যাহ্নের মর্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো,
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো।
যেন আমি বুঝি মনে, অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।

১ পৌষ [১৩০৯]

উদ্‌বোধন

জাগো রে, জোগো রে, চিত্ত, জাগো রে—
জোয়ার এসেছে অশ্রু- সাগরে।
কূল তার নাহি জানে, বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জনগানে জাগো রে।
তরী তোর নাচে অশ্রু- সাগরে।

আজি এ উষার পুণ্য-লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই বাজে মহামন্ত্র সেই
অজানা যাত্রার এই লগনে
দিক্ হতে দিগন্তের গগনে।

জানি না, উদার শুভ্র আকাশে
কী জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না, কিসের লাগি অতল উঠেছে জাগি—

বাহু তোলে কারে মাগি আকাশে
পাগল কাহার দীপ্ত আভাসে ॥

শূন্য মরুময় সিন্ধু- বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র খেলাতে।
হেথায় জাগ্রত দিন বিহঙ্গের গীতহীন
শূন্য এ বালুকালীন বেলাতে,
এই ফেনতরঙ্গের খেলাতে ॥

দুলে রে, দুলে রে, অভ্র দুলে রে
আঘাত করিয়া বক্ষ- কূলে রে।
সম্মুখে অনন্ত লোক, যেতে হবে যেথা হোক—
অকূল আকুল শোক দুলে রে,
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণ- কূলে রে।
আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী—
খুলে দে, খুলে দে বন্ধ তরণী।
অশান্ত পালের 'পরে বায়ু লাগে হাহা ক'রে,
দূরে তোর থাক্ পড়ে ধরণী—
আর না রাখিস রুদ্ধ তরণী ॥

১১ পৌষ ১৩০৯

একাকী

আজিকে তুমি ঘুমাও— আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ, আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে—
তোমার লাগি আমি
এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী ॥

তোমার বাহু কত-না দিন শ্রান্তিদুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি,
আজিকে তারে সকল তার কর্ম হতে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হতে আমার পূজা লহো গো আঁখিসলিলে—
আমার স্তবগান।

শান্তিনিকেতন
২১ পৌষ ১৩০৯

রমণী

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি,
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

শান্তিনিকেতন
১ মাঘ ১৩০৯

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে, 'এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে—
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ।

'ছিলি আমার পুতুল-খেলায়, ভোরে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি ।
তুই আমার ঠাকুরের সনে ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি ।

'আমার চিরকালের আশায়, আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে,
পুরানো এই মোদের ঘরে গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে ।

'যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ।

'সব দেবতার আদরের ধন নিত্যকালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সি ।
তুই জগতের স্বপ্ন হতে এসেছিস আনন্দস্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি ।

'নির্নিমেষে তোমায় হেরে তোর রহস্য বুঝি নে রে—
সবার ছিলি, আমার হলি কেমনে !
ওই দেহে এই দেহ চুমি মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে ।

'হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে—
জানি নে কোন্ মায়ায় ফেঁদে বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে।'

খেলা

তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া!
বিহান-বেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণদুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া॥

কিসের সুখে সহাস-মুখে নাচিছ বাছনি,
দুয়ার-পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি!
তাথেই-থেই তালির সাথে কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাঁচনি॥

ভিখারি ওরে, অমন করে শরম ভুলিয়া
মাগিস কিবা মায়ের গ্রীবা আঁকড়ি ঝুলিয়া!
ওরে রে লোভী, ভুবনখানি গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি দিব কি তুলিয়া?।

নিখিল শোনে আকুল-মনে নূপুর-বাজনা,
তপন শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে নয়ন-মাজনা॥

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি নয়ন-ঢুলানি—
গায়ের 'পরে কোমল করে পরশ-বুলানি!
মায়ের প্রাণে তোমার লাগি জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানি॥

কেন মধুর

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়মাঝে বুঝি রে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজমনে তরল রবে—
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে।

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে—
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি।

বীরপুরুষ

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।

তুমি যাচ্ছ পাল্‌কিতে, মা, চ'ড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন-মনে তাই
ভয় পেয়েছ— ভাবছ 'এলেম কোথা'।
আমি বল্‌ছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে—
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই-যে কিসের আলো?'

এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে'
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে!
তুমি ভয়ে পাল্‌কিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে—

বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্‌কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন, মা, করো!'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া খবরদার,
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে রে রে রে রে'।

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে!'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।'
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।

বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল,
কী দুর্দশাই হত তা না হলে!'

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা?
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে—
দাদা বলত, 'কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে!'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে!'

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা, মা গো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি—
তবে তুমি আমার কাছে হারো—
তখন কি, মা, চিনতে আমায় পারো?
তুমি ডাকো 'খোকা কোথায় ওরে',
আমি শুধু হাসি চুপটি করে।

যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে—
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে।

তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে ॥

দুপুরবেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে।
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি।
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে ॥

সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল-ঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ করে, মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
'গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, 'দুষ্টু, ছিলি কোথা ?'
আমি বলব, 'বলব না সে কথা।'

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে ডাকবি যখন খোকা ব'লে
বলব আমি, 'নাই সে খোকা নাই !'
মা গো, যাই ॥

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে যাব, মা, তোর বুকে বয়ে—

ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব, মা, ঢেউ— জানতে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে॥

বাদলা যখন পড়বে ঝরে রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গাব ওই বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে চমক মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে?।

খোকার লাগি তুমি, মা গো, অনেক রাতে যদি জাগ
তারা হয়ে বলব তোমায় 'ঘুমো'।
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো॥

স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে।
জেগে তুমি মিথ্যে আশে হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে॥

পুজোর সময় যত ছেলে আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে'।
আমি তখন বাঁশির সুরে আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে॥

পুজোর কাপড় হাতে ক'রে মাসি যদি শুধায় তোরে
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে',
বলিস 'খোকা, সে কি হারায়— আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে'॥

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লিটি তার দখলে—
সবাই তারি পুজো যোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায় কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে আছে আমার সন্দেহ।
ভোরের বেলা আঁধার থাকে, ঘুম যে কোথা ছোটে ওর-
বিছানাতে হুলুস্থুলু কলরবের চোটে ওর।
খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি করে পালাতে যায় মায়ের কোলে না গিয়ে।

হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়, আমি তখন নাচারই,
কাঁধের 'পরে তুলে তারে করে বেড়াই পাচারি।
মনের মতো বাহন পেয়ে ভারি মনের খুশিতে
মারে আমায় মোটা মোটা নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হয়ে বলি 'একটু রোসো রোসো মা',
মুঠো করে ধরতে আসে আমার চোখের চশমা।
আমার সঙ্গে কলভাষায় করে কতই কলহ—
তুমুল কাণ্ড, তোমরা তারে শিষ্ট আচার বলহ!

তবু তো তার সঙ্গে আমার বিবাদ করা সাজে না—
সে নইলে যে তেমন করে ঘরের বাঁশি বাজে না।
সে না হলে সকালবেলায় এত কুসুম ফুটবে কি?
সে না হলে সন্ধেবেলায় সন্ধেতারা উঠবে কি?
একটি দণ্ড ঘরে আমার না যদি রয় দুরন্ত,
কোনোমতে হয় না তবে বুকের শূন্য পূরণ তো।
দুষ্টুমি তার দখিন-হাওয়া সুখের-তুফান-জাগানে—
দোলা দিয়ে যায় গো আমার হৃদয়ের ফুল-বাগানে।

নাম যদি তার জিগেস কর সেই আছে এক ভাবনা,
কোন্ নামে যে দিই পরিচয় সে তো ভেবেই পাব না।
নামের খবর কে রাখে ওর, ডাকি ওরে যা খুশি
দুষ্টু বলো, দস্যি বলো, পোড়ারমুখি রাক্ষুসি।
বাপ-মায়ে যে নাম দিয়েছে বাপ-মায়েরই থাক্ সে নয়—
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি তুলে রাখুন বাক্সে নয়।

একজনেতে নাম রাখবে কখন অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে, ভারি বিষম শাসন এ।
নিজের মনের মতো সবাই করুন কেন নামকরণ—
বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার, খুড়ো ডাকুন রামচরণ।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে সংস্কৃত নামটা ওই—
এতে কারো দাম বাড়ে না অভিধানের দামটা বৈ।
আমি বাপু, ডেকেই বসি যেটাই মুখে আসুক-না—
যারে ডাকি সেই তা বোঝে, আর-সকলে হাসুক-না।
একটি ছোটো মানুষ, তাঁহার এক শো রকম রঙ্গ তো!
এমন লোককে একটি নামেই ডাকা কি হয় সংগত?।

উপহার

স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই, কী-যে দেব তাই ভাবনা।
যত দিতে সাধ করি মনে মনে খুঁজে পেতে সে তো পাব না।
আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে সবাই করেছে একতা,
বাকি যে এখন আছে কত ধন না তোলাই ভালো সে কথা।
সোনা রুপো আর হীরে জহরত পোঁতা ছিল সবই মাটিতে,
জহরি যে যত সন্ধান পেয়ে নে গেছে যে যার বাটীতে।
টাকাকড়ি মেলা আছে টাঁকশালে, নিতে গেলে পড়ি বিপদে।
বসনভূষণ আছে সিন্দুকে, পাহারাও আছে কি পদে।

এ যে সংসারে আছি মোরা সব এ বড়ো বিষম দেশ রে,
ফাঁকিফুকি দিয়ে দূরে চলে গিয়ে ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন যে যাহারে পারে দেয়-যে।
তাও কত থাকে, কত ভেঙে যায়, কত মিছে হয় ব্যয়-যে।
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত, চোখে যদি দেখা যেত রে,
কতগুলো তবে জিনিসপত্র বল্ দেখি দিত কে তোরে।
তাই ভাবি মনে কী ধন আমার দিয়ে যাব তোরে লুকিয়ে—
খুশি হবি তুই, খুশি হব আমি।— বাস্, সব যাবে চুকিয়ে॥

কিছু দিয়ে-থুয়ে চিরদিন-তরে কিনে রেখে দেব মন তোর,
এমন আমার মন্ত্রণা নেই, জানি নে'ও হেন মন্তর।
নবীন জীবন, বহুদূর পথ পড়ে আছে তোর সুমুখে,
স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই পিয়ে নিস এক চুমুকে।
সাথিদলে জুটে চলে যাস ছুটে নব আশে, নব পিয়াসে—
যদি ভুলে যাস, সময় না পাস, কী যায় তাহাতে কী আসে ?
মনে রাখিবার চির-অবকাশ থাকে আমাদেরই বয়সে,
বাহিরেতে যার না পাই নাগাল অন্তরে জেগে রয় সে॥

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে যায় চলে দেশ-বিদেশে।
যার কোল হতে ঝরনার স্রোতে এসেছে আদরে গলিয়া
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোটো নদীটিরে চিরদিন রাখে স্মরণে,
যত দূরে যায় স্নেহধারা তার সাথে যায় দ্রুতচরণে।
তেমনি তুমিও থাক নাই থাক, মনে কর মনে কর না—
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া আমার আশিস-ঝরনা॥

প্রচ্ছন্ন

মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে, নিভৃত
স্বপনে।
ওগো, কোথা মোর আশার অতীত!
ওগো, কোথা তুমি পরশচকিত!
কোথা গো স্বপনবিহারী!
তুমি এসো এসো গভীর গোপনে,
এসো গো নিবিড় নীরব চরণে
বসনে প্রদীপ নিবারি, এসো গো
গোপনে।
মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব আছে স্বপনে, নিভৃত
স্বপনে॥

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি,
পথ ভরিয়াছে আলোকে, প্রখর
আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী।
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি পরম
পুলকে।
এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে
এসো না পথের আলোকে, প্রখর
আলোকে॥

ছল

তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল—
বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব ছলনা—
যে কথা তুমি বলিতে চাও সে কথা তুমি বল না।

তোমারে পাছে সহজে ধরি কিছুরই তব কিনারা নাই—
দশের দলে টানি গো পাছে বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব ছলনা—
যে পথে তুমি চলিতে চাও সে পথে তুমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ, তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও—
হেলার ভরে খেলার মতো ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও?
বুঝেছি আমি, বুঝেছি তব ছলনা—
সবার যাহে তৃপ্তি হল তোমার তাহে হল না।

চেনা

আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি,
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।
আজ আসিয়াছ কৌতুকবেশে
মানিকের হার পরি এলো কেশে,
নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে এসেছ হৃদয়পুলিনে।
ভুলি নে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলি নে চতুর নিঠুর বাক্যে, ভুলি নে।
করপল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত?
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব সহি গো।

আজ এই বেশে এসেছ আমায় ভুলাতে।
কভু কি আস নি দীপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে ?
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা,
জলে-ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়ভরে-সারা করুণ পেলব মুরতি।
দেখেছি তোমার বেদনাবিধুর
পলকবিহীন নয়নে মধুর মিনতি।
আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে,
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব সহি গো॥

মরীচিকা

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না॥

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না॥

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে চাহে যেন বাঁশি মম
উতলা পাগল-সম।
যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না॥

আমি চঞ্চল হে

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে—
ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসি।
সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাসরি॥

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাসরি॥

প্রসাদ

'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা!
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা।'
শিশির কহিল কাঁদিয়া—
'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া,
হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলই অশ্রুজল।'

'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া—
'ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।'

প্রবাসী

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া॥

রহিয়া রহিয়া নববসন্তে ফুলসুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলনবিহীন মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারি ভিতে
পারি নি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশিদিশি জাগাইছে চিতে বিরহবেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরই হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে॥

তৃণে-পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে॥

নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে,
লক্ষযোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি,
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী কোন্ কথা মনে আনে সে!
অনাদি উষার বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে॥

এ সাত-মহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে!
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে—
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে।
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরজনমের ভিটাতে॥

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই ধুলারেও মানি আপনা—
ছোটো বড়ো হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল, কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা॥

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস্?
মোর তরে, জল, দু হাত বাড়াস?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে সবাই আমারে টানিছে॥

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিরগৌরব— এ কথা না যদি শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে॥

ধুলা-সাথে আমি ধুলা হয়ে রব সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল তাঁর পূজারতি-বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব সে গৌরবের চরণে॥

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল, ধন্য আমার ধরণী,
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর তারকা হিরণবরনী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে,
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে বিপুল ভুবনতরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী॥

৩ ফাল্গুন ১৩০৭

আবর্তন

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা-
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥

অতীত

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও?
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন, তুমি তারে কোথা লও?
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও॥

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও?
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও॥

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি, সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও॥

নব বেশ

সেদিন কি তুমি এসেছিলে ওগো, সে কি তুমি, মোর সভাতে?
হাতে ছিল তব বাঁশি, অধরে অবাক হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল মদবিহ্বল শোভাতে।
সে কি তুমি ওগো, তুমি এসেছিলে সেদিন নবীন প্রভাতে—
নবযৌবনসভাতে?।

সেদিন আমার যত কাজ ছিল সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন্ খেলা, কোথা কেটে গেল বেলা,
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার রক্তকমল দুলালে।
পুলকিত মোর পরানে তোমার বিলোল নয়ন বুলালে,
সব কাজ মোর ভুলালে॥

তার পরে হায় জানি নে কখন্ ঘুম এল মোর নয়নে।
উঠিনু যখন জেগে ঢেকেছে গগন মেঘে,
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া দলিত পত্রশয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে কাননে কুসুমচয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে॥

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর, রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতলশয়ান আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে, তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে?॥

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন তাপসমুরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা ঝলিছে অনল-পারা,
সিক্ত তোমার জটাজুট হতে সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপসমুরতি ধরিয়া॥

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত, এসো মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না অতিথি, সব ধন মোর না লয়ে—
এসো এসো ভাঙা আলয়ে॥

মরণমিলন

অত চুপিচুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরই ধরণ!
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।

আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

হায় এমনি ক'রে কি ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ?
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে?
শেষে পসারিয়া তব হিমকোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ?
আমি বুঝি না যে কেন আস যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কহো মিলনের একি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই?
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ববে না?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌ববম্‌ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর,
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

তুমি চুরি করে কেন এস চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

শুধু নীরবে কখন্ নিশি-ভোর
শুধু অশ্রুনির্ঝর-ঝরন।
তুমি উৎসব করো সারা রাত
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে,
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব শরণ—
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ—
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধো-জাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ—
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

আমি যাব যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ—
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।

যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

জন্ম ও মরণ

সে তো সেদিনের কথা বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে।
আজ সেথা কী করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হতে টানি লয় যত মোর গীতি।
এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ ভুবননাথ! সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে-গাঁথা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি তাও তব পূজাশেষে
লবে সবে তোমা-সাথে মোরে ভালোবেসে,
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে।
যে প্রবাসে রাখো সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে ॥

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে

বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে। প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে,
বাহিরে আসিবে ছুটি— অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

শিবাজি-উৎসব

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্-এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে,
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ—
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ—

শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমলনির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লিসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি ॥

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রলিখা।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্বপত্র যথা—
সেদিনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কী ছিল বারতা ॥

তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা— মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হল তার সীমা ॥

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে ॥

সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম !
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধুলায় হল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম !
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে ॥

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি ॥

হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত, হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন ॥

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগী,
গিরিদরীতলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে,
সেইমত বাহিরিলে— বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা ॥

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে,
কী অপূর্ব হেরি,
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরি।
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার ॥

মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে ॥

আজও তার সেই মন্ত্র— সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে

একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ—
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বয়ে,
সেই তব কাজ॥

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য রণ-অশ্বদল
অস্ত্র খরতর—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
'হর হর হর'।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি,
করিল আহ্বান—
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামী,
বাঙালির প্রাণ॥

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন-শতাব্দ-কাল ধরি—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে,
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণী-রূপে আনি দিবে নূতন পরান
নূতন প্রভাত॥

মারাঠার প্রান্ত হতে একদিন তুমি, ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে
রাজা ব'লে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।

তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা—
লুকানু তরাসে ॥

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূরতি
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি চিনেছি চিনেছি হে রাজন্,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ ॥

সেদিন শুনি নি কথা— আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল।
‘একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে’ এ মহাবচন
করিব সম্বল ॥

মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
‘জয়তু শিবাজি’।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে

একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে ॥

গিরিধি
ভাদ্র ১৩১১

সুপ্রভাত

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া ।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি,
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া ।
এমন সময়ে, ঈশান, তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া ।
বাজে রে গরজি বাজে রে,
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগনমাঝে রে ।
চমকি জাগিয়া পূর্ব ভুবন
রক্তবদন লাজে রে ॥

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ !
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী ;
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী ?
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে ?
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে ?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল কাটিয়া—

তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।
ব্যথায় ভুবন ভরিছে—
ঝর ঝর করি রক্ত-আলোক
গগনে গগনে ঝরিছে।
কেহ-বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
কেহ-বা স্বপনে ডরিছে॥

তোমার শ্মশানকিঙ্করদল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারি
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ'পরে,
খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে-
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দোহো রে।
ওরে দীনপ্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে॥

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়ডমরু বাজাব ;
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিবশঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে !
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে।

জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয় ;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে—
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।
তিমিররাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

শান্তিনিকেতন
৮ বৈশাখ ১৩১৪

নমস্কার

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
যার লাগি নরদেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকটযাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়— সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণকরে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মতো? জয় তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়-
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা! কোন্ অমানুষ

তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল!
মোছ্‌ রে দুর্বল চক্ষু, মোছ্‌ অশ্রুজল॥

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্‌ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য-পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক-পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি! শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর—
কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত-প্রায়—
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্যকারাগারে॥

বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী

উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল-ঝঙ্কার—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার॥

তার পরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে,
যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, 'দুঃখ কিছু নয়—
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার!
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির।
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।'

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩১৪

শুভক্ষণ

ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে—
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে!
বলে দে আমায় কী করিব সাজ
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্ বরনের বাস॥

মা গো, কী হল তোমার, অবাক্‌নয়নে মুখপানে কেন চাস?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূরপুরে—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ রহিব বলো কী মতে॥

২

ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে—
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধুলার 'পরে॥

মা গো, কী হল তোমার, অবাক্‌নয়নে, চাহিস কিসের তরে?
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে—
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ, ধুলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে॥

শান্তিনিকেতন। ১০ শ্রাবণ ১৩১২

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই-যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা—
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তার হলে একাকার মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া
ধুলা দিয়া ঘর রচনা করিয়া
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন ঘরকরনের কাজ।
জানে না করিতে সাজ॥

কহে এরে গুরুজনে
'ও যে তোর পতি' 'ও তোর দেবতা'— ভীত হয়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়—
খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তার, 'পালিব পরানপণে
যাহা কহে গুরুজনে।'

বাসকশয়ন'পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়,
কত শুভখন বৃথা চলি যায়—
যে হার তাহারে পরালে সে হার কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন'পরে॥

শুধু দুদিনে ঝড়ে—
দশ দিক ত্রাসে আঁধারিয়া আসে ধরাতলে অম্বরে,
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা পড়ে থাকে তার—
তোমারে সবলে রহে আঁকরিয়া, হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস,
এই দেখিতেই বুঝি ভালোবাস—
খেলাঘর-দ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে কী যে পাও পরিচয়!
মোরা মিছে করি ভয়।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া—
শতযুগ করি মানিবে তখন ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে।

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জানো জানো তুমি ধুলায় বসিয়া এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরই তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে—
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ নন্দনবনমধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু।

১৫ শ্রাবণ ১৩১২

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে আমি এসে শুধাই তারে ডেকে,
'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে ?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা !'
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো ক্ষণেক-তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, 'ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে ।'
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে,
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে ॥

ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে আমি এসে শুধাই ডেকে তারে,
'তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে ?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা !'
আমার মুখে দুটি নয়ন কালো ক্ষণেক-তরে রইল চেয়ে ভুলে ;
সে কহিল, 'আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে !'
চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে ॥

অমাবস্যা আঁধার দুইপহরে শুধাই আমি তাহার কাছে গিয়ে,
'ওগো, তুমি চলেছ কার তরে প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে ?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা !'
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে ;
সে কহিল, 'এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে ।'

চেয়ে দেখি, লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জলে অকারণে।

শান্তিনিকেতন
২৫ শ্রাবণ ১৩১১

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হল, সাঙ্গ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম আসবে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত রুদ্ধ হল রাতের মতো—
দুয়েক জনে বলেছিল, 'আসবে মহারাজ।'
আমরা হেসে বলেছিলেম, 'আসবে না কেউ আজ।'

দ্বারে যেন আঘাত হল শুনেছিলেম সবে—
আমরা তখন বলেছিলেম, 'বাতাস বুঝি হবে।'
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে শুয়েছিলেম আলসভরে—
দুয়েক জনে বলেছিল, 'দূত এল বা তবে।'
আমরা হেসে বলেছিলেম, 'বাতাস বুঝি হবে।'

নিশীথরাতে শোনা গেল কিসের যেন ধ্বনি—
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি কাঁপল ধরা থরহরি—
দুয়েক জনে বলেছিল, 'চাকার ঝনঝনি।'
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা, 'মেঘের গরজনি।'

তখনো রাত আঁধার আছে, বেজে উঠল ভেরি—
কে ফুকারে, 'জাগো সবাই, আর কোরো না দেরি।'
বক্ষ-'পরে দু হাত চেপে আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে—
দুয়েক জনে কহে কানে, 'রাজার ধ্বজা হেরি।'
আমরা জেগে উঠে বলি, 'আর তবে নয় দেরি।'

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য, কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল, কোথায় সিংহাসন!
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা— কোথায় সভা কোথায় সজ্জা!
দুয়েক জনে কহে কানে, 'বৃথা এ ক্রন্দন,
রিক্তকরে শূন্য ঘরে করো অভ্যর্থন।'

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা—
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে, বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা—
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা॥

কলিকাতা
২৮ শ্রাবণ ১৩১২

দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব, চাই নি সাহস করে—
সন্ধেবেলায় যে মালাটি গলায় ছিলে প'রে,
আমি চাই নি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হলে যখন পারে যাবে চলে
ছিন্ন মালা শয্যাতলে রইবে বুঝি পড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো এসেছিলেম ভোরে,
তবু চাই নি সাহস করে॥

এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি!
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র-হেন ভারী,
এ যে তোমার তরবারি।
তরুণ আলো জানলা বেয়ে পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে 'কী পেলি তুই নারী'।
নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি—
এ যে ভীষণ তরবারি॥

তাই তো আমি ভাবি বসে, একি তোমার দান—
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি, নাই যে হেন স্থান।
ওগো, একি তোমার দান!
শক্তিহীনা মরি লাজে, এ ভূষণ কি আমায় সাজে,
রাখতে গেলে বুকের মাঝে ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎ-মাঝে ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর ক'রে রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে রাখব পরান-ময়।
তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধন ক্ষয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়॥

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি করব না আর সাজ।
নাই-বা তুমি ফিরে এলে ওগো হৃদয়-রাজ,
আমি করব না আর সাজ।
ধুলায় বসে তোমার তরে কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে মান্‌ব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায় সাজিয়ে দিল আজ—
আমি করব না আর সাজ॥

গিরিডি
১৬ ভাদ্র ১৩১২

কৃপণ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম লাগতেছিল চক্ষে মম—

কত কালে কত লোকে কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধুলা এইখানেতে এসে।
বসেছিল জ্যোৎস্নারাতে স্নিগ্ধ শীতল আঙিনাতে,
কয়েছিল সবাই মিলে নানা দেশের কথা।
প্রভাত হলে পাখির গানে জেগেছিল নূতন প্রাণে
দুলেছিল ফুলের ভারে পথের তরুলতা॥

আমি যেদিন এলেম সেদিন দীপ জ্বলে না ঘরে
বহুদিনের শিখার কালী আঁকা ভিতের 'পরে।
শুষ্কজলা দিঘির পাড়ে জোনাক ফিরে ঝোপে-ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমার দিনের যাত্রাশেষে কার অতিথি হলেম এসে
হায় রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি, হায় রে ক্লান্ত কায়া॥

৮ বৈশাখ ১৩১৩

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি,
তোমার এবার সময় কখন হবে!
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি,
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে!
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা
কেনাবেচা নানান হাটে হাটে॥

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারই কুঞ্জে উঠে জাগি।
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার করপদ্মদলের লাগি।

রেখেছি আজ শান্ত শীতল ক'রে
অঙ্গন মোর চন্দনসৌরভে।
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে,
তোমার এবার সময় কখন হবে?।

আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া-সনে।
দখিন-হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে,
আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে—
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের 'পরে মরবে মাথা কুটে।

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
থমথমিয়ে আসবে যখন জল,
বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে,
চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচল,
শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে,
তোমার এবার সময় হবে কবে?।

কলিকাতা
১৭ বৈশাখ, ১৩১৩

দিঘি

জুড়ালো রে দিনের দাহ, ফুরালো সব কাজ,
কাটল সারা দিন—
সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্ন-ভরা রাত
সকল-কর্ম-হীন।

তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু
এইটুকু সময়
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ডুবুডুবু—
ঘরে কি মন রয় ?।

কূলে-কূলে-পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়॥

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি ক'রে,
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভ'রে।
ভেসে গেলেম আপন-মনে, ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে—
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে॥

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ-রাত্রি বন্দী হয়ে আছ—
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন—

হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ ।
তীরের কর্ম সেরে আমি পায়ের ধুলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে ।
এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছল্‌ছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে !
ছায়ানিচোল দিয়ে ঢাকা মরণ-ভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাধা হতে—
কাঁদিল মোর মন ।

শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলিতে
ক্লান্ত আশার ডাক ।
ম্লান' ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
উড়ে গেল কাক ।
মর্মরিয়া মর্মরিয়া বাতাস গেল মরে
বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মতো
দিঘির কালো জলে ।

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে,
বাজল দূরে শাঁখ—
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক ।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে, নাইকো কোনো আলো,
এলেম ঘরে ফিরে ।
দিন ফুরালো, রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা
দিঘির কালো নীরে ।

শান্তিনিকেতন
২৭ বৈশাখ ১৩১৩

প্রচ্ছন্ন

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে?
যারা ধুলা পায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে যায়,
তারা তোমায় ভাবে মিছে।
আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি ডালি—
ওগো, যে আসে সেই একটি-দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি॥

ওগো, সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে—
চোখে লাগছে ঘুমঘোর।
সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে,
মনে লজ্জা লাগে মোর।
আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের 'পরে
যেন ভিখারিনির মতো—
কেহ শুধায় যদি 'কী চাও তুমি' থাকি নিরুত্তরে
করি দুটি নয়ন নত॥

আজি কোন্ লাজে বা বলব আমি তোমায় শুধু চাহি,
আমি বলব কেমন করে—
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনী দিন বাহি,
তুমি আসবে আমার তরে।
আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্যে তব
তারে দিব বিসর্জন—
ওগো, অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব।
তাহা রইল সংগোপন॥

আমি সুদূর-পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন-মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে—
তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজনে
তোমার সকল আলো জ্বেলে।
তোমার রথের 'পরে সোনার ধ্বজা ঝলবে ঝলমল,
সাথে বাজবে বাঁশির তান—
তোমার প্রতাপ-ভরে বসুন্ধরা করবে টলমল,
আমার উঠবে নেচে প্রাণ॥

তখন পথের লোক অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,
তুমি নেমে আসবে পথে।
হেসে দু হাত ধ'রে ধুলা হতে আমায় তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।
আমার ভূষণ-বিহীন মলিন বেশে ভিখারিনির সাজে
তোমার দাঁড়াব বাম পাশে,
তখন লতার মতো কাঁপব আমি গর্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে॥

ওগো, সময় বয়ে যাচ্ছে চলে, রয়েছি কান পেতে—
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি!
তোমার এ পথ দিয়ে কত-না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রণরণি।
তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে,
তুমি রবে সবার শেষে!
হেথায় ভিখারিনির লজ্জা কি গো ঝরবে নয়ন-জলে—
তারে রাখবে মলিন বেশে?॥

শান্তিনিকেতন
২ আষাঢ় ১৩১৩

আত্মত্রাণ

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

১৩১৩

আষাঢ়সন্ধ্যা

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে
বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন-মনে—
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে॥

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল—
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন সুরে আজ ভরিয়ে তুলি—
কোন ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হয়ে—
বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে॥

২ আষাঢ় ১৩১৬

বেলাশেষে

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে—
ওরে, ডাকে আমায় পথের 'পরে সেই ধ্বনিতে।

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া।
ওরে, প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ— উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা—
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।

১৩ ভাদ্র ১৩১৬

অরূপরতন

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি।

যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।
রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ ১৩১৬

স্বপ্নে

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণবরন পারিজাত লয়ে হাতে।

নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে—
বারেক থামিয়া, মোর বাতায়নপানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে ॥

স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে,
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধুলায়-লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে ॥

কতবার আমি ভেবেছিনু, 'উঠি উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি।'
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে ॥

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

সহযাত্রী

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে ॥

আজও সময় হয় নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি—
ওগো, ওই-যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।

মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি
আপন কুলায়-মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথ-মাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

শান্তিনিকেতন
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

বর্ষার রূপ

আজি বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে—
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিয়া ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।

পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।
জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া প'ড়বে জলে;
নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে।

ঈশান কোণেতে ওই-যে ঝড়ের বাণী
গুরুগুরু রবে কী করিছে কানাকানি।
দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠিছে কোন্ আসন্ন কাজে।

১১ আষাঢ় ১৩১৭

প্রতিসৃষ্টি

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহপ্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান॥

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি—
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥

১৩ আষাঢ় ১৩১৭

ভারততীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে— তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

১৮ আষাঢ় ১৩১৭

দীনের সঙ্গী

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন-দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।

১৯ আষাঢ় ১৩১৭

অপমানিত

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে   বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে   দুর্ভিক্ষের-দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে   ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে   আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি   দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীনপতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

২০ আষাঢ় ১৩১৭

ধুলামন্দির

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে— দেবতা নাই ঘরে॥

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে॥

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

কয়া। গোরাই
২৭ আষাঢ় ১৩১৭

সীমায় প্রকাশ

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়-পুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।

গোরাই। জানিপুর
২৭ আষাঢ় ১৩১৭

যাবার দিন

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

২০ শ্রাবণ ১৩১৭

অসমাপ্ত

জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা॥

জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে, জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা॥

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

শেষ নমস্কার

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।
ঘনশ্রাবণমেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্ তব ভবন-দ্বারে॥

নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে॥

হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবস-রাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে॥

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

পথ-চাওয়া

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে—
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ।

সারা দিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা।
শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।

শিলাইদহ
১৭ চৈত্র ১৩১৮

ভাসান

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে ব'সে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা করে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি?।

জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে—
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস? সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি।

শিলাইদহ
২৩ চৈত্র ১৩১৮

খড়্গ

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে॥

জীবনশেষের শেষ-জাগরণ-সম ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত।

হ্যাম্প্‌স্টেড
২৫ জুন ১৯১২

চরম মূল্য

'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে'
পশরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি ক'রে হায় আমার
দিন যে চলে যায়—
মাথার 'পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউ-বা আসে, কেউ-বা হাসে, কেউ-বা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট-মাথে অস্ত্র-হাতে রাজা এল রথে।
বললে হাতে ধরে 'তোমায়
কিনব আমি জোরে'—
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে।
মুকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল, হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বললে
'কিনব দিয়ে সোনা'—
উজাড় করে দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা॥

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুল-তলার কাছে।
বললে কাছে এসে 'তোমায়
কিনব আমি হেসে'—
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে।
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে॥

সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে
যেন আমায় চিনে বললে
'অমনি নেব কিনে'—
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে॥

আর্বানা। য়ুক্তরাজ্য। আমেরিকা
৮ জানুয়ারি ১৯১৩

সুর

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাবাভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবনবাঁশিতে
জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে— সেই সুরে মোরে বাজাও॥

সাজাও আমারে সাজাও
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারই গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে, সেই সাজে মোরে সাজাও॥

মধ্যধরণী সাগর
১৪ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]

দিনান্ত

জানি গো দিন যাবে এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজবে বেণু, নদীর কূলে চরবে ধেনু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু, পাখিরা গান গাবে—
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে॥

তোমার কাছে আমার এ মিনতি—
যাবার আগে জানি যেন আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশ-পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী—
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা—
পরানে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি।
তোমার কাছে আমার এই মিনতি॥

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।—
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা—
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা॥

রোহিত সাগর
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

ব্যর্থ

যদি　　প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন　ভোরের আকাশ ভরে দিলে　এমন গানে গানে ?
কেন　　তারার মালা গাঁথা,
কেন　　ফুলের শয়ন পাতা,
কেন　দখিন হাওয়া গোপন কথা　জানায় কানে কানে ?॥

যদি　　প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন　আকাশ তবে এমন চাওয়া　চায় এ মুখের পানে ?
তবে　　ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার　হৃদয় পাগল হেন
তরী　সেই সাগরে ভাসায় যাহার　কূল সে নাহি জানে ?॥

শান্তিনিকেতন
২৮ আশ্বিন ১৩২০

সার্থক বেদন।

আমার　সকল কাঁটা ধন্য করে　ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার　সকল ব্যথা রঙিন হয়ে　গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার　অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া　আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে　সুগন্ধধন লুটবে॥

আমার　লজ্জা যাবে যখন পাব　দেবার মতো ধন,
যখন　রূপ ধরিয়ে বিকশিবে　প্রাণের আরাধন।
আমার　বন্ধু যখন রাত্রিশেষে　পরশ তারে করবে এসে
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব　চরণে তার লুটবে॥

১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

উপহার

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক 'কী নিলি তোর দান'।
দেখাব যে সবার কাছে এমন আমার কী বা আছে?
সঙ্গে আমার আছে শুধু এই কখানি গান।

ঘরে আমায় রাখতে যে হয় বহু লোকের মন—
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে করব মূল্যবান॥

শিলাইদহ
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

গানের পারে

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়-মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে—
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে?।

শান্তিনিকেতন
২৮ ফাল্গুন ১৩২০

নিঃসংশয়

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, এই তো সবই সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে, জীবন আমার ভরে ওঠে—
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি।

সকাল-সাঁঝে সুর যে বাজে   ভুবন-জোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার   তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কি আর বুঝব কিবা,   এই তো দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা— পথে কি আর তোমায় খুঁজি।

শান্তিনিকেতন
২ চৈত্র ১৩২০

সুরের আগুন

তুমি যে   সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন   ছড়িয়ে গেল সবখানে।
যত সব   মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে   হাত তোলে সে কার পানে ?।

আঁধারের   তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার   পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে !
নিশীথের   বুকের মাঝে এই-যে অমল   উঠল ফুটে স্বর্ণকমল,
আগুনের   কী গুণ আছে কে জানে।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

গানের টান

কেন   তোমরা আমায় ডাকো, আমার   মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে,   পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ দিকের পানে   গানে গানে।

দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি— নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম ফোটার বেলা, আকাশে আজ রঙের মেলা—
সকল দিকেই আমায় টানে   গানে গানে।

কলিকাতা
২৭ চৈত্র [১৩২০]

অতিথি

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি মলিন না হয় চরণ তারি—
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥

তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন, চিত্ত হল পুলক মগন—
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো।
তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো, ওই আলোতে জ্বেলো গো॥

শান্তিনিকেতন
৩ বৈশাখ ১৩২১

দেহ

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ!
তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ!
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ!
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য!
সে যে সঙ্গিনী মোর, আমারে সে দিয়েছে বর-মালা।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।

শান্তিনিকেতন
৩ বৈশাখ ১৩২১

নিবেদন

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী—
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা॥

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়-পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা—
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা॥

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে॥

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩২১

সুন্দর

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর
সুন্দর হে সুন্দর!
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর—
সুন্দর হে সুন্দর॥

এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।

তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও-যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর—
সুন্দর হে সুন্দর॥

রামগড়। হিমালয়
৩১ বৈশাখ [১৩২১]

আলোকধেনু

এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্যতারা দলে দলে—
কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগন-তলে!
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা;
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥

সকালবেলা দূরে দূরে উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে!
আঁধার হলে সাঁঝের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত—
মোর জীবনের রাখাল ওগো, ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে॥

রামগড়। হিমালয়
১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]

পরশমণি

আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।
আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে॥

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।

নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে।
আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে॥

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

শরণ্ময়ী

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে
তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাত-কিরণ-মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি— ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলিবনের উদাস বায়ু পড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়—
আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে॥

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

মোহন মৃত্যু

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে!
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে!
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলো চুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?॥

কাঁপন ধরে বাতাসেতে—
পাকা ধানের তরাস লাগে, শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রু-সাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?॥

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

শারদা

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে—
বনের পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি॥

মানিক-গাঁথা ওই-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গিতে—
শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি॥

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

জয়

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়॥

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়

মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।

মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ

সে যে লঙ্ঘিবে বনপর্বত,

মোর বীর্য তোমার জয়রথ

তোমারি পতাকা শিরে বয়॥

সুরুল

২২ ভাদ্র [১৩২১]

ক্লান্তি

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু,

পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।

এই-যে হিয়া থরোথরো কাঁপে আজি এমনতরো

এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু॥

এই দীনতা ক্ষমা করো, প্রভু,

পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।

দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,

সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু॥

শান্তিনিকেতন

১০ আশ্বিন [১৩২১]

পথিক

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।

দিন সে কাটায় গণি গণি বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,

তারার আলোয় গায় সে সারা রাতি।

কত যুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,

কত কালের ক্লান্ত আশা

ঘুমায় তাহার ধুলায় আঁচল পাতি॥

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা, পথে যেতেই ভালোবাসা—
পথে-চলার নিত্য রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি॥

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

পুনরাবর্তন

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ননীরে॥

কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি,
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিম্বা আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে—
নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে॥

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

সুপ্রভাত

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার?
আজি প্রাতে সূর্য-ওঠা সফল হল কার?
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে—
উষা কাহার আশিস্ বহি হল আঁধার পার?॥

বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা—
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা ?
বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে ?
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘোচায় অন্ধকার ?।

বুদ্ধগয়া
প্রভাত। ২৪ আশ্বিন [১৩২১]

পথের গান

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দ-গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে জন পিছন-পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে—
তুফান তারে ডাকে অকুল নীরে
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া॥

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া॥

বেলা স্টেশন
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

সাথি

পথের সাথি, নমি বারম্বার—
পথিকজনের লহো নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার॥

ওগো নবপ্রভাত-জ্যোতি, ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবন-রথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার॥

রেলপথে
বেলা হইতে গয়ায়
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

জ্যোতি

ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়—
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়॥

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়—
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়—
তোমারি হউক জয়।

প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

এলাহাবাদ
প্রভাত। ৩০ আশ্বিন [১৩২১]

কলিকা

মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা
অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।

ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা॥

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা-কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথি, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি
বিদায়বেলায় আজিও রহিল বাকি॥

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে॥

এলাহাবাদ
সন্ধ্যা। ২ কার্তিক [১৩২১]

অঞ্জলি

এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপমুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে

হে মোর অতিথি যত ! তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণবরিষনে ।
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ-বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে । যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে ।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম ।

এলাহাবাদ
প্রভাত । ১ কার্তিক ১৩২১

সবুজের অভিযান

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা ।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায় ,
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায় ।
ওই-যে প্রবীণ, ওই-যে পরম পাকা—
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায় ।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ।

বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে—
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, একি বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা॥

শিকল-দেবীর ওই-যে পূজাবেদি
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

আন রে টেনে বাঁধা পথের শেষে।
বিবাগি কর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে—
ঘুচিয়ে দে, ভাই, পুঁথিপোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩২১

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে, কেমন করে সইব!
বাতাস আলো গেল মরে, একি রে দুর্দৈব!
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে, গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে— আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে ওই-যে অভয় শঙ্খ।

চলেছিলেম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য
খুঁজি সারা দিনের পরে কোথায় শান্তিস্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়ক্ষত ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত তোমার মহাশঙ্খ।

আরতিদীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথব রক্তজবার মালা ? হায় রজনীগন্ধা !
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি নীরব তব শঙ্খ॥

যৌবনেরই পরশমণি করাও তবে স্পর্শ।
দীপক তানে উঠুক ধ্বনি দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে উদ্‌বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে তোমার জয়শঙ্খ॥

জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ-বা ছুটে আসবে পাশে, কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব— আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ।

রামগড়
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

ছবি

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ?
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,

ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?।

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন—
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে ?
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায়।
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন—
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই।
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে—

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল-
সে যে আজ হল কতকাল!
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে!
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী॥

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশপাথারে;
পথের দু ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবননির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশীরবি,
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি!
তুমি ছবি!
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে, রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হ'ত স্বপনের।

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে— ভুলি নে কি ফুল,
ভুলি নে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ,
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে—
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

এলাহাবাদ
রাত্রি। ৩ কার্তিক ১৩২১

শা-জাহান

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্‌, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্‌
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে

বসন্তের মাধবীমঞ্জরি
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল—
বিদায়গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্ন দল।
সময় যে নাই,
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

·

হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে!
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে

অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা,
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে—
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্যবিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ—
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল

যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল্
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনাকল্লোল-সাথে নহবত মিলায় না তান।
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্বণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

মিথ্যা কথা! কে বলে যে ভোল নাই?
কে বলে রে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির-অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির?
সমাধিমন্দির এক ঠাঁই রহে চিরস্থির,
ধরার ধুলায় থাকি

স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে!
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে।
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো, যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজসিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে—
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে

তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বর-পানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
'যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

এলাহাবাদ
রাত্রি। ১৪ কার্তিক ১৩২১

চঞ্চলা

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে,
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ, সেই চলা তোমার রাগিণী—
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা, ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি।
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলো চুল;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চলপল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;
বারম্বার ঝ'রে ঝ'রে পড়ে ফুল—
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও—

ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়—
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয় ॥

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে ॥

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্যসুন্দরী,

তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন॥

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি,
নাহি জানে কেউ—
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
খলিয়া খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে;
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্, সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর্।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে—

তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে— অকূল আলোতে॥

এলাহাবাদ
রাত্রি। ৩ পৌষ ১৩২১

দান

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান?
প্রভাতের গান?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির 'পরে।
অবসন্ন গান
হয় অবসান॥

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে?
কী তোমারে দিব আনি?
সন্ধ্যাদীপখানি?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের—
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?
এ যে, হায়,
পথের বাতাসে নিবে যায়॥

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার—
হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
তার ভার
কেনই বা সবে
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা, ম্লান ছিন্ন হবে ?
নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি ॥

তার চেয়ে, যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি—
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে,
সেই আলো অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার ॥

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া স্বরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি—
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান॥

শান্তিনিকেতন
১০ পৌষ ১৩২১

বলাকা

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার-তরু সারে সারে;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি॥

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে ॥

হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সররমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন ॥

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগি!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!'

হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি—
এই গিরিরাজি
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

শ্রীনগর। কার্তিক ১৩২২

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো
শিয়রের এই জানলাদুটো, গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ ;
কতরকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ—
একটুমাত্র অসাবধানেই বিষম কর্মভোগ।
এইটে ভালো, ওইটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে
নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে
সবাই আমায় বললে— লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি।

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে ;
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা ?
এই জীবনটা ভালো কিম্বা মন্দ কিম্বা যা-হোক-একটা কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু ?
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা

পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা—
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে, সেই চাকাটা ওই-যে থামল যেন—
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন ?।

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে-বিভোল দক্ষিণবায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল ,
হেঁকেছিল, 'খোল্ রে দুয়ার খোল্।'
সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।
হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া , হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত ; হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা , কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায়
পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ-খেলায়।
থাক্ সে কথা।
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।

জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা-ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।

বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল, বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে—
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি,
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা।
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।
জনম মরণ এক হয়েছে ওই-যে অকূল বিরাট মোহানায়,
ওই অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্।
মরণ-বাসর-ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।

চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝারে সে
ওই-যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নিনিমেষে।
মধুর ভুবন মধুর আমি নারী।
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি,
দাও খুলে দাও দ্বার —
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার॥

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো ;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর-দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, 'হাওয়া বদল করো।'
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি।

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে-আবডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে ;
মিলন ছিল ছাড়া-ছাড়া,
চাপা-হাসি টুকরো-কথার নানান্ জোড়াতাড়া।
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশ-ভরা সকল আলো ধ'রে
বর-বধূরে নিলে বরণ করে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে॥

রেল-লাইনের ও পার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারই ভার বইবে কেমন ক'রে?
সংসারের ওই ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগছে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার,
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাশুর সামনে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে—
সেই কথাটা মনে করে পুলক দিল গায়ে॥

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি,
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ ঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রীশালায়।
মনে হল, এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, 'কেন এই তো বেশ।'
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,
'দেখো দেখো, একাগাড়ি কেমন চলে!

আর দেখেছ ?— বাছুরটি ওই, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ !
ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচিল-ঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই-যে রেলের কাছে—
ইস্টেশনের বাবু থাকে ? আহা, ওরা কেমন সুখে আছে !'

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে ,
বলে দিলেম, 'বিনু. এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে ।'
প্ল্যাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে ।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার—
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার ।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, 'কথা একটা আছে ।'

ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম ক'রে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম ।
বিনু বললে, 'রুক্‌মিণী ওর নাম ।
ওই-যে হোথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ওইখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি ।
তেরো-শো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল ; স্বামী স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে ।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে কী-এক নদীর ধারে—'
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
'রুক্‌মিণীর এই জীবন-চরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে ।

আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।'
বাঁকিয়ে ভুরু পাকিয়ে চক্ষু বিনু বললে খেপে,
'কক্‌খনো না, বলব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে?
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।'
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে;
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামি।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই।
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারই,
সে ভাবনাটা ভারি
রুক্মিণীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার 'পরে ভার
কুলিনারীর ভাবনা ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

অবাক কাণ্ড একি!
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি!
জাতে হয়তো মেথর হবে কিম্বা নেহাত ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে!
এমন হলে দেউলে হতে ক দিন বাকি থাকে!
'আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে। আমি দেখছি, মোট

একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই।'
বিনু বললে, 'এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।'
'আচ্ছা, দেব তবে'
এই ব'লে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে-
আচ্ছা ক'রেই দিলেম তারে হেঁকে,
'কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি!
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি!'
কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধরে
দু টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু মাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, 'এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্যসিঁদুর-সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে,
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।'

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি,
সেই দু মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি—
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।

দিই যদি আজ রুক্মিণীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।
বিনু যে সেই দু মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে—
জানল না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারই হাতে॥

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে,
'রুক্মিণী সে কোথায় আছে?'
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে—
রুক্মিণী কে তাই বা কজন জানে।
অনেক ভেবে 'ঝামরু কুলির বউ' বললেম যেই
বললে সবে, 'এখন তারা এখানে কেউ নেই।'
শুধাই আমি, 'কোথায় পাব তাকে?'
ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, 'সে খবর কে রাখে!'
টিকিটবাবু বললে হেসে, 'তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিম্বা খসরুবাগে
কিম্বা আরাকানে।'
শুধাই যত 'ঠিকানা তার কেউ কি জানে'
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ॥

কেমন করে বোঝাই আমি— ওগো, আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন,
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
'এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে'
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে!
রয়ে গেলেম দায়ী,
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী॥

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, 'মঞ্জুলী মোর ওই তো কচি মেয়ে,
ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে, বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুণো সে বড়ো—
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়োসড়ো।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।'
বাপ বললে, 'কান্না তোমার রাখো।
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে—
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে!
সমাজে তো উঠতে হবে, সেটা কি কেউ ভাবো ?
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব ।'
মা বললে, 'কেন, ওই যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাই-বা হল কুলীন,
দেখতে যেমন তেমনি স্বভাবখানি,
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি—
সোনার টুকরো ছেলে।
এক পাড়াতে থাকে ওরা, ওরই সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হল— ওকে যদি বলি আমি আজই
এক্ষুনি হয় রাজি।'
বাপ বললে, 'থামো।
আরে আরে রামোঃ !
ওরা আছে সমাজের সব-তলায়।
বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায় !
দেখতে-শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল ! রাধে !
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে !'
যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক

প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতি ক্ষণে হানছে যেন বেদনাবিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য,
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহায়-বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতি ক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এ দিক - ও দিক একটু হবার জো নেই।
তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর—
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়-বেলায় মেয়েকে বাপ ব'লে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি,
'হও তুমি সাবিত্রীর মতো, এই কামনা করি।'

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু মাস যেতেই ফলল কেমন ক'রে—
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে;
কিন্তু মেয়ের কপাল-ক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে;
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত

স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো।

অবশেষে হল

মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।

কখন শিশুকালে

হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে

বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি

প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি —

জানত না তো আপ্‌নাকে সে,

শুধায় নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খেপা বাতাস এসে,

সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে

মধুর রসে ভ'রে উঠে।

সে যে প্রেমের ফুল

আপন রাঙা পাপড়িভারে আপ্‌নি সমাকুল।

আপ্‌নাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি —

তাই তো থাকি থাকি

চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।

আকাশ-পারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝর্না বেয়ে;

রাতের অন্ধকারে

কোন্ অসীমের রোদন-ভরা বেদন লাগে তারে!

বাহির হতে তার

ঘুচে গেছে সকল অলংকার,

অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে —

তাই দেখে সে আপ্‌নি ভেবে মরে।

কখন কাজের ফাঁকে

জানলা ধ'রে চুপ ক'রে সে বাইরে চেয়ে থাকে —

যেখানে ওই সজনেগাছের ফুলের ঝুরি বেড়ায় গায়ে

রাশি রাশি হাসির ঘায়ে

আকাশটারে পাগল করে দিবস-রাতি।
যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে!
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।
পায়ের শব্দ তারি
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুন্‌গুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জল-ভরা এক ছায়া;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো;
কেঁদে বলে, 'হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো!'

একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাঙ্গ ক'রে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধ'রে
ঘুমের আগে যেমন চিরাভ্যাস
পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বললেন বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
'যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্ব'রে,
আমি কিন্তু পারি যেমন করে

মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।'
বাপ বললেন কঠিন হেসে, 'তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে ;
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।'
এই বলে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বললেন, 'উঃ কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে!'
বাপ বললেন, 'আমি পাষাণ বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননীর পুতুল হলে
এত দিনে কেঁদেই যেতেম গ'লে।'
মা বললেন, 'হায় রে কপাল, বোঝাবই বা কারে,
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল ওইটুকু ওই মেয়ে—
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।'
বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, 'মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন, নেই সে ওদের জ্ঞান।'
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান॥

দুখের তাপে জ্ব'লে জ্ব'লে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে—

শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবাভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি।
সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিম্বা লুচি,
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা,
পাঁঠা হত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দু বেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে;
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে,
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে।
গয়লানি আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নালিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে পদেই ঘটে যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি,
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।

হয়ে নীরব নত
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন ক'রে মাতা বারম্বার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেমনি ক'রেই সুপ্রসন্নমুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে—
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ—
'আমার মায়ের যত্ন যে জন পেয়েছে একবার,
আর-কিছু কি পছন্দ হয় তার।'

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে,
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারে বারেই আসতে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো—
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনো দিন!
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।

ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনি-রিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে।

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত-পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে
চুপ করে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগীসেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—
'জান তুমি, তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।
সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পুরাতে চাই যেমন ক'রেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি?'

'না না, ছিছি ছিছি!'
এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা দু হাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝ'রে পড়ে।
ভাবলে, 'পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো, এবার মরণ হোক!'

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধ'রে।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে—
যে বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে।
দু তিন ঘণ্টা পর
একবার যে ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের 'পরে লোটায়।
যে দেখল সেই অবাক হয়ে রইল চেয়ে,
বললে, 'ধন্যি মেয়ে!'

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, 'গর্ব করি নেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্যব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর, নইলে দেখতে অন্যরকম হত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরই কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।'

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে
গুজব গেল শোনা—
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয় নিকো বিশ্বাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশ্বাস।

ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব—
আসছে ঘরে নানারকম বিলিতি আসবাব।
দেখলে বাপের নতুন ক'রে সাজসজ্জা শুরু—
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকা চুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা॥

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুক-ভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক-না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি সুধামাখা,
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা;
সাধ্বীর সেই সাধন-পুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ॥

ছেড়ে লজ্জাভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,
'তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে!
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাৎনি-নাতি যত
সবার মাথা করবে নত?
মায়ের কথা ভুলবে তবে?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে!'
বাবা বললে শুষ্ক হাসে,
'কঠিন আমি কেই বা জানে না সে!

আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়—
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা।
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা
যে করে ভয় দুঃখ নিতে, দুঃখ দিতে,
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে!'

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর ;
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের ক দিন আগে। বউকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি প'ড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে
সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানী।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিভে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, 'কী হয়েছে বামী?'
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, 'হারিয়ে গেছি আমি!'

তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে,
আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি,
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, 'হারিয়ে গেছি আমি!'

ঠাকুরদাদার ছুটি

তোমার ছুটি নীল আকাশে, তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থইহারা ওই দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল-তলায়, গোলাবাড়ির কোণে,
তোমার ছুটি ঝোপেঝাপে পারুল-ডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আশা কাঁপে কাঁচা ধানের ক্ষেতে,
তোমার ছুটির খুশি নাচে নদীর তরঙ্গেতে।

আমি তোমার চশমা-পরা বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাজের মাকড়সাটার বিষম জালে বাঁধা।

আমার ছুটি সেজে বেড়ায় তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারই ওই চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই আমার ছুটি আছে॥

তোমার ছুটির খেয়া বেয়ে শরৎ এল মাঝি,
শিউলিকানন সাজায় তোমার শুভ্র ছুটির সাজি।
শিশির-হাওয়া শির্‌শিরিয়ে কখন রাতারাতি
হিমালয়ের থেকে আসে তোমার ছুটির সাথি।
আশ্বিনের এই আলো এল ফুল ফোটানো ভোরে
তোমার ছুটির রঙে রঙিন চাদরখানি প'রে॥

আমার ঘরে ছুটির বন্যা তোমার লাফে ঝাঁপে,
কাজকর্ম হিসাবকিতাব থর্‌থরিয়ে কাঁপে।
গলা আমার জড়িয়ে ধর, ঝাঁপিয়ে পড় কোলে—
সেই তো আমার অসীম ছুটি প্রাণের তুফান তোলে।
তোমার ছুটি কে যে জোগায় জানি নে তার রীত—
আমার ছুটি জোগাও তুমি, ওইখানে মোর জিত॥

মনে-পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে-
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে॥

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে ভোরে শিউলিবনে

শিশির ভেজা হাওয়া বেয়ে ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে ভাসে।
কবে বুঝি আনত মা সেই ফুলের সাজি বয়ে—
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে—
মনে হয় মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধ'রে কবে দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে।

১ আশ্বিন ১৩২৮

খেলাভোলা

তুই কি ভাবিস দিন রাত্তির খেলাতে আমার মন?
কক্ষনো তা সত্যি না মা, আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে বৃষ্টিবাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে বাঁশের ডালে ডালে।
ছুটির দিনে কেমন সুরে পুজোর সানাই বাজছে দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে।
খেলনাগুলো সামনে মেলি কী-যে খেলি, কী-যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্তখন ভাবনু আপন মনে।
লাগল না ঠিক কোনো খেলাই, কেটে গেল সারা বেলাই—
রেলিং ধ'রে রইনু বসে বারান্দাটার কোণে।

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার আসে মাঝে মাঝে—
সেদিন আমার মনের ভিতর কেমনতরো বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগনি রঙের শাড়ি।

চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই, তেপান্তরের পার বুঝি ওই—
মনে ভাবি ওইখানেতেই আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তক্ষুনি যে যেতেম তারে লাগাম দিয়ে ক'ষে।
যেতে যেতে নদীর তীরে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমিরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছের তলায় বসে॥

এক-এক দিন যে দেখেছি তুই বাবার চিঠি হাতে
চুপ করে কী ভাবিস বসে ঠেস দিয়ে জানলাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে তুই যেন কোন্ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই— হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ-পারে কোন্ বটের তলার বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে, মনে ভাবি কোন্ কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ি ছিল কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে অজানা সেই দ্বীপের ঘরে
তোমায় আমায় ভোরবেলাতে নৌকোতে পাল তুলে॥

১১ আশ্বিন ১৩২৮

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি,
আমি তবে এক্‌খনি হই ইচ্ছামতী নদী।
রইবে আমার দখিন ধারে সূর্য-ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায় নামবে অন্ধকার,
আমি কইব মনের কথা দুই পারেরই সাথে—
আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে॥

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই আপন গাঁয়ের ঘাটে
ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই দূরের মাঠে মাঠে।

গাঁয়ের মানুষ চিনি— যারা নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা সাঁতরে ও পার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের নতুনতরো বেশ—
নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে, অদ্ভুতের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো টুকরো আলোর রাশি—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন, হাততালি আর হাসি।
নীচের তলায় তলিয়ে যেথায় গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই রয়েছে চুপচাপ।
কোণে কোণে আপন-মনে করছে তারা কী কে,
আমারই ভয় করবে কেমন তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিনবে আমায় কেবল একটুখানি,
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে আমিই সে কি জানি।
এক ধারেতে মাঠে ঘাটে সবুজ বরন শুধু,
আর-এক ধারে বালুর চরে রৌদ্র করে ধূ ধূ।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা, রাত্রিরে থম্-থম্—
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে করবে গা ছম্-ছম্॥

২০ আশ্বিন ১৩২৮

তালগাছ

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে॥

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার
মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝর্‌ঝর্ থথর
কাঁপে পাতাপত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও —
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি —
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

২ কার্তিক ১৩২৮

অন্য মা

আমার মা না হয়ে তুমি আর-কারো মা হলে—
ভাবছ তোমায় চিনতেম না, যেতেম না ওই কোলে?
মজা আরো হত ভারি—
দুই জায়গায় থাকত বাড়ি,
আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে তুমি পারের গাঁয়ে।

এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হ'ত খেলা,
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে পেরিয়ে যেতেম নায়ে।
হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি বলতেম, বল্ দেখি কে।'
তুমি ভাবতে চেনার মতো, চিনি নে তো তবু।
তখন কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
আমি বলতেম গলা ধ'রে,
'আমায় তোমার চিনতে হবেই, আমি তোমার অবু।'

ওই পারেতে যখন তুমি আনতে যেতে জল
এই পারেতে তখন ঘাটে বল্ দেখি কে বল্।
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছত সে বুঝতে কি সে কার?
সাঁতার আমি শিখি নি যে,
নইলে আমি যেতেম নিজে—
আমার পারের থেকে আমি যেতেম তোমার পার।
মায়ের পারে অবুর পারে
থাকত তফাত, কেউ তো কারে
ধরতে গিয়ে পেত নাকো, রইত না একসাথে।
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখাদেখি দূরে দূরে,
সন্ধেবেলায় মিলে যেত অবুতে আর মা'তে।

কিন্তু হঠাৎ কোনো দিনে যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে নাই হ'ত, মা রাজি?
ঘরে তোমার প্রদীপ জেলে
ছাতের 'পরে মাদুর মেলে

বসতে তুমি, পায়ের কাছে বসত খ্যাস্তবুড়ি—
উঠত তারা সাত ভায়েতে,
ডাকত শেয়াল ধানের ক্ষেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাদুড় কোথায় যেত উড়ি।
তখন কি, মা, দেরি দেখে
ভয় পেতে না থেকে থেকে—
পার হয়ে, মা, আসতে হতই অবু যেথায় আছে।
তখন কি আর ছাড়া পেতে,
দিতেম কি আর ফিরে যেতে—
ধরা পড়ত মায়ের ও পার অবুর পায়ের কাছে॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরিগাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসবসাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্য কক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশিরসিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরবসংগীত তব দ্বারে?॥

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্যনব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম—
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণকোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে,
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন, কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সংগীত তব; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব-নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি কবি কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া— রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানা সূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।

আজও যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে

দেখায় অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু, যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা! বন্ধুমিলনের দিনে বারম্বার
উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই ব'লে; অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই—আজি, বাধা কিগো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব— উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে নূতন আনন্দগানে? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে-মিলিত-মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি, আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা,
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে

হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশরসুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজহাতে কবে আমি ওই খেয়া-'পরে করি ভর—
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের-দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে,
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণদিনে, শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথরাত্রে, হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলীগুণ্ঠনতলে ?।

ধরণীতে প্রাণের খেলায়

সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্তকবি, মুহূর্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়—

কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ! যেমনি অপূর্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত ; আশা করি, মর্তজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্তলোকের দ্বারে— ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা ॥

আষাঢ় ১৩২৯

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনারসে-উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি—
হে ভোলা সন্ন্যাসী ?
চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুকমঞ্জরী-সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি ?
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায় ?॥

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাশরি ?
দস্যু তারা হেসে হেসে, হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জীরা বাঁশরি ;
গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদনরসে
ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে ॥

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে আনিল বাহির-তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা॥

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য তব উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্‌বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার॥

সেদিন উন্মত্ত তুমি যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধরে।
ললাটের চন্দ্রালোকে নন্দনের স্বপ্নচোখে
নিত্যনূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা—
রূপতরঙ্গিমা॥

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা?
মুছিলে— চুম্বনরাগে-চিহ্নিত বঙ্কিম রেখালতা
রক্তিম অঙ্কনে।

অগীত সংগীতধার অশ্রুর সঞ্চয়ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ?
তোমার তাণ্ডবনৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি ?।

নহে নহে, আছে তারা— নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।
তোমার জটায় হারা গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে!
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
'নাহি রে, নাহি রে'।

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড়নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের-শাসন-নাশন
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন—
তারি সম্ভাষণ ॥

তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহলকোলাহল আনি
মোর গান হানি ॥

হে শুষ্কবল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে ॥

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহতলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।
ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি ॥

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী—
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে॥

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরীমূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু— চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে॥

কার্তিক ১৩৩০

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে মনে হল যেন চিনি—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গিনী!
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে, বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোকে তোমারে চিনি॥

এলো চুলে ব'হে এনেছ কী মোহে সেদিনের পরিমল ?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে—
সে দিনের তুমি এলে এ দিনের সাজে ওগো চিরচঞ্চল !
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে সে দিনের পরিমল ॥

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী, ভুলায়েছ বারে বারে ?
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার কঙ্কণঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে, কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চলচাহনিতে ভুলায়েছ বারে বারে ॥

নদীকূলে-কূলে কল্লোল তুলে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগনকোনায়-কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায় ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে ॥

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা কাজের কক্ষকোণে ?
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা তব খেলাপ্রাঙ্গণে ?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে—
অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে নিষ্ফল আয়োজনে ?
কাজ ভোলাবারে ফের' বারে বারে কাজের কক্ষকোণে ॥

আবার সাজাতে হবে আভরণে মানসপ্রতিমাগুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরণে বুলাব রসের তুলি ?
বিবাগি মনের ভাবনা ফাগুনপ্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে, পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে মানসপ্রতিমাগুলি ?।

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সে দিনের সেই বাঁশি—
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়— সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি অমাবস্যার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে, নীরবে লভিব তারে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে ?।

যদি রাত হয় না করিব ভয়, চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি হে গোপনরঙ্গিণী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে—
তবু সব কথা যাবে সে আমায় ব'লে—
তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে হে রসতরঙ্গিণী !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো, চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাল্গুন ১৩৩০

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশে উদ্‌বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্র-মাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে—
অগ্নির প্রবাহ,
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারম্বার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বনমন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত।

তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমোনম।
তমিস্রসুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদিকবি,
ধ্বংস করি তম।
সে বংশী আমারি চিত্ত ; রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরি,

নির্ঝরে কল্লোল—
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবনহিল্লোল ॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী—
আয়ুস্রোতোমুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে-পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ ॥

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে!
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা,
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—
না বাঁধুক মোরে ॥

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণবর্ষণে।
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীরগুঞ্জনকলরবে
উপলঘর্ষণে।

ঝঞ্ঝার মদিরা-মত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে॥

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনি
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাঙ্গনে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি॥

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ—
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে গোধূলিলগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোকবিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

হারুনা-মারু জাহাজ
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে॥

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি
'আছি, আমি আছি।'
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি
বাঁচি আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্ব'লে—
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্যকলরোলে॥

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্তহস্তে আকাশে আকাশে—
ক্লান্তি নাহি জানে॥

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে, নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে—
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারি ধারে
বিপিনে বিপিনে॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে,
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্পভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে—
রিক্ততারে টুটি
রহস্যসমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি।

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।

মর্তের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু বাহু বাড়ালে॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে,
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ—
অসত্যেরে হানে॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ—
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।

কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁওয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে ?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে ?।

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো আনো ডাকি—
বর্ষণকাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে-ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ—
সব লও লুটে।

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি, দিগন্ত-অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি,
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপসুন্দর আবির্ভাব—
অশ্রুধৌত জ্যোতি।

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী ?
দক্ষিণপবন
বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি,
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।

কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার ?।

জানি জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনি ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্রগানে
জাগায়ে দিলে না—
তিমিররাত্রির বাণী গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ?।

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে !
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নবজন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা—
প্রভাতী ভৈরবী ?।

হারুনা-মারু জাহাজ
১ অক্টোবর ১৯২৪

ক্ষণিকা

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা-
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা !
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা ॥

ভেবেছিনু গেছি ভুলে; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি, সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার।
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি॥

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল, তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী॥

সেদিন ঢেকেছে তারে কী-এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরম লগ্নে, সখী,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান—
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।

অপূর্ণের রেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি—
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি ?
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভাণ ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান ॥

গেল না ছায়ার বাধা, না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা। সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে ॥

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা—
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা ॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৬ অক্টোবর ১৯২৪

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ
ওগো খেলার সাথি ?
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি ?
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি ?

উদয়ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জালিয়ে সাঁঝের বাতি ?।

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।
বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুকনো পাতার তলে ?
যে সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে
উছল চোখের জলে—
কাঁপত যে সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে।

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভ'রে সাজি
সোনার চাঁপা ফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ওই-যে আসে আজি,
এ কি পথের ভুলে ?
বকুল-বীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে ?
সেই সাজি তার দখিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ দুলে।
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে,
এ কি পথের ভুলে ?।

আমার কাছে কী চাও তুমি ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা ?
চাও কি তুমি যেমন ক'রে হল দিনের শুরু
তেমনি হবে সারা ?

সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে—
কাজ-ভোলা সব খেপার দলে তেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা ?
স্বপনমৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
তেমনি হব সারা ॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাকো ?
সকল চিন্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে
থরথরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাকো ?
না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরই মাঝখানে
তাই আমারে ডাকো ॥

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা
ওগো খেলার সাথি !
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি ।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি ।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি ॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৭ অক্টোবর ১৯২৪

কৃতজ্ঞ

বলেছিনু 'ভুলিব না' যবে তব ছল ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরি থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে, মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে, তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
চঞ্চল আলোক ছায়া কতকাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতি মুহূর্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা কোরো তবে॥

তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফ'লে,
আজও নাই শেষ। রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—

বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি, একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি,
হৃদিমাঝে। আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি,
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে— সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি— সব চেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন॥

আণ্ডেস জাহাজ
২ নভেম্বর ১৯২৪

দান

কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম, হয়তো খুশি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক-তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে—
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকনদুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে॥

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে,
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে!
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে?
বাতাসেতে-উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন ক'রেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে, বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে—
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ ব'লেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্ খনিতে কোন্ ধনভাণ্ডারে,
সাগর-তলে কিম্বা সাগর-পারে,
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয় প্রিয়ে!
তাই তো বলি যা-কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান
আপন হৃদয় দিয়ে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর ১৯২৪

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে, যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা। নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণগগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরই বাণী ,
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি।
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।'
তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, 'তোমারে যে জানি আমি জানি।'
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি—
'প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।'

বুয়েনোস এয়ারিস
১৫ নভেম্বর ১৯২৪

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার॥

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই।

হঠাৎ তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুলসংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম॥

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে—
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে, ফিরে চাহিব না পিছে
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি॥

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো—
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি, সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধ'রে ঝলুক তোমার কালো কেশে॥

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে—
বনসরসীর তীরে ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ॥

তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দ'লে
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।

বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে ॥

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে, সমুখের পথ দিয়ে—
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি—
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী ॥

বুয়েনোস এয়ারিস
২১ নভেম্বর ১৯২৪

বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর-ধ্যান-ভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্তে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নববরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ—
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

সূর্যপ্রদক্ষিণ করি ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মিটিকা।
সমুদ্রতরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা ॥

আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে।
সার্থক হল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলনমাঙ্গল্যহোম প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে
রক্তিম আগুনে।

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম, যত প্রয়োজন
হল অবসান।
বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন—
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি,
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসশর্বরী,
বনে জাগে গান।

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল-তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসন্ধ্যা স্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীরধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তিক্লান্তিভরে।

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?

ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজালবলে
করো অলংকার।
সে বন্ধন দোলরজ্জু স্বর্গে মর্তে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম বাণীর মানসসরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র সুরে সুরে সংগীতনির্ঝরে
বর্ষিছে ঝংকার॥

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্তে, হে মর্তের প্রিয়,
নিত্য নাই হলে,
সুদূর মাধুর্য-পানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে—
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দাররেণু শিরে তার ঊর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরা
রবে তার কোলে।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ—
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সেদিন অম্বরমাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্তের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে জীবন
মরণতোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ

যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে— দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে, যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়;
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ; চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর-উৎসবমন্ত্র-হীন;
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়—
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু

উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে—
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস— তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা॥

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির।
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
শুনিতে মৌনের মহাবাণী; দুশ্চিন্তার গুরুভারে,
নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি— সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধ রূপ। ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ-জয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান,
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী— সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,

সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব, তারি দূত হয়ে,
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।

[শান্তিনিকেতন]
৯ চৈত্র ১৩৩৩

কুটিরবাসী

তোমার কুটিরের সমুখবাটে
পল্লীরমণীরা চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি, উঠেছে হাসি—
উদাসী বিবাগির চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের বুকেতে বাজে।

যা-কিছু আসে যায় মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি তোমার ঘরে।
ঘাসের কাঁপা লাগে, পাতার দোলা,
শরতে কাশবনে তুফান তোলা,
প্রভাতে মধুপের গুন্‌গুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিঁরবে জালবুনানি।

দেখেছি ভোরবেলা ফিরিছ একা,
পথের ধারে পাও কিসের দেখা!
সহজে সুখী তুমি জানে তা কেবা,
ফুলের গাছে তব স্নেহের সেবা—
এ কথা কারো মনে রবে কি কালি

মাটির 'পরে গেলে হৃদয় ঢালি ?।

দিনের পরে দিন যে দান আনে
তোমার মন তারে দেখিতে জানে।
নম্র তুমি, তাই সরলচিতে
সবার কাছে কিছু পেরেছ নিতে—
উচ্চ-পানে সদা মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে দাও নি ফাঁকি॥

চাও নি জিনে নিতে হৃদয় কারো
নিজের মন তাই দিতে যে পারো।
তোমার ঘরে আসে পথিকজন,
চাহে না জ্ঞান তারা, চাহে না ধন—
এটুকু বুঝে যায় কেমন-ধারা
তোমারি আসনের শরিক তারা॥

তোমার কুটিরের পুকুর-পাড়ে
ফুলের চারাগুলি যতনে বাড়ে।
তোমারো কথা নাই, তারাও বোবা-
কোমল কিশলয়ে সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু মুখ না খোলে—
সহজে বোঝা যায় নীরব ব'লে॥

তোমারি মতো তব কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতাক'টি আলোয় নাচে—
সমুখে খোলা মাঠ করিছে ধু-ধু,
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে খেজুর শুধু॥

তোমার বাসাখানি আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে কালের ঝুঁটি।
দেখি যে পথিকের মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে, পাতার মতো—
যখন যাবে, রেখে যাবে না ক্ষত॥

নাইকো রেষারেষি পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি সহজে করে।
কীর্তিজালে-ঘেরা আমি তো ভাবি—
তোমার ঘরে ছিল আমারও দাবি,
হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে॥

[শান্তিনিকেতন]
চৈত্র ১৩৩৩

নীলমণিলতা

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণিমঞ্জরির গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে?
আকাশ যে মৌনভার বহিতে পারে না আর,
নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণিলতা॥

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নকায়া—
যে মৌন নিজেরে চায় সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে—
দুর্গমরহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে॥

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর-অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্মের নির্বাক্ কথা পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্মল নীলে— আনন্দের সেই নীলদ্যুতি
নীলমণিমঞ্জরির পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকৃতি॥

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে—
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে, হে লতা, চিনালে আপনাকে।
বেল জুঁই শেফালিরে জানি আমি ফিরে ফিরে—
কত ফাল্গুনের কত শ্রাবণের আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা॥

চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা!
বাদলের চামেলি যে কালো-আঁখি-জলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণঝংকারস্বরে মাখা—
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা॥

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছনীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে—
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব কেন এ কে জানে॥

'কেন এ কে জানে' এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে,
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে—
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে॥

কেন এ কে জানে এত বর্ণ গন্ধ রসের উল্লাস—
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানচ্ছায়ে মধ্যাহ্নের মন্দ বায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম 'কেন এ কে জানে'॥

অভ্যাসের-সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে, হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে—
বিশ্ব-পানে চাহিলাম, কহিলাম 'কেন এ কে জানে'॥

আমি আজ কোথা আছি প্রবাসে অতিথিশালা-মাঝে,
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ, চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল-ফোটাবার অবসানে—
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে॥

ভরতপুর
১৭ চৈত্র ১৩৩৩

উদ্‌বোধন

ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু—
শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে শুরু!
ভাবিয়াছিনু গীতবিহীন
গোধূলিছায়ে হল বিলীন
পরান মম, হিমে-মলিন আড়াল তারে ঘেরি—
এমন ক্ষণে কেন গগনে বাজিল তব ভেরি?॥

উত্তরবায় কারে জাগায়, কে বুঝে তার বাণী—
অন্ধকারে কুঞ্জদ্বারে বেড়ায় কর হানি।

কাঁদিয়া কয় কাননভূমি,
'কী আছে মোর, কী চাহ তুমি ?
শুষ্ক শাখা যাও যে চুমি, কাঁপাও থরথর—
জীর্ণ পাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর।'

বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা,
তুলিছ ধ্বনি কী আগমনী আজি যাবার বেলা !
যৌবনেরে তুষারডোরে
রাখিয়াছিলে অসাড় ক'রে,
বাহির হতে বাঁধিলে ওরে কুয়াশাঘন জালে—
ভিতরে ওর ভাঙালে ঘোর নাচের তালে তালে॥

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক খান্‌-খান্‌,
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক প্রাণ।
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,
শঙ্খ কহে হুহুংকারি বাঁধন সে তো মায়া—
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া॥

এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরই জয়—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়তোরণ গড়ে আনন্দের তানে -
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে॥

বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে বন্দী করি তারে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না যে,
পালিছ তারে আঁধার-মাঝে—

নিশীথনাচে ডমরু বাজে, অরুণদ্বার খোলে—
জাগে মুরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে॥

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা—
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্যলোল চরণতলে মুক্তি পায় ধরা—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা॥

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়, চৈৎ-ফসলের শূন্য ক্ষেতে
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায় বিদায় নিয়ে যেতে যেতে—

আয় রে ওরে মৌমাছি, আয়, চৈত্র যে যায় পত্রঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায় ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা,
সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী আমের মুকুল সব ঝরে নি,
কুঞ্জবনের প্রান্তধারে আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয় রে তোরা মৌমাছি, আয়, আসবে কখন শুক্‌নো খরা,
প্রেতের নাচন নাচবে তখন রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা॥

শুনি যেন কাননশাখায় বেলাশেষের বাজায় বেণু,
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায় স্মরণ-ভরা গন্ধরেণু।
কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু এই বছরের মৌচাকেতে।
নূতন দিনের মৌমাছি, আয়, নাই রে দেরি, করিস ত্বরা—
শেষের দানে ওই রে সাজায় বিদায়দিনের দানের ভরা॥

চৈত্রমাসের-হাওয়ায়-কাঁপা দোলন-চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়-দাহের রৌদ্রতাপে বৈশাখে আজ ফুটবে জানি।
যা-কিছু তার আছে দেবার শেষ করে সব নিবি এবার—
যাবার বেলায় যাক চলে যাক বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
আয় রে ওরে মৌমাছি, আয়, আয় রে গোপন-মধু-হরা-
চরম দেওয়া সঁপিতে চায় এই মরণের স্বয়ম্বরা।

[শান্তিনিকেতন]
১২ চৈত্র ১৩৩৩

সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুক বাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী।'

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে;
শুধালে, 'কেন এলে!'
কহিনু আমি 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।'
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল;
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল।
দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।

কুহেলী গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি ॥

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকনদুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
'অতিথি আমি' কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিত করে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে, কহিলে, 'কেন এলে!'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে—
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'
চাহিলে হাসিমুখে,
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল্‌।
মধুর হল বিধুর হল মাধবীনিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণচাঁদ হাসে আকাশকোলে,
আলোকছায়া শিবশিবানী সাগরজলে দোলে ॥

ফুরালো দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।

লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতন-ভরা তরী ॥

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি—
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নতমুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিত কল্লোলে ॥

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক-বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক বাণ নাহি আমার হাতে,
এবার আমি আনি নি ডালি দখিনসমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা—
দেখো তো চেয়ে, আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না ॥

নায়ার জাহাজ
১ অক্টোবর ১৯২৭

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি ,
তার পানে, হায়, শেষ চাওয়া চায় করুণ কুন্দকলি ।
উত্তরবায় একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল, গেল তারে দলি দলি ॥

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে গোধূলিরে করে ম্লান',
তাহারি আড়ালে নবীন কালের কে আসিছে সে কি জানো ।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি 'কে আসে কী জানি',
বলে মর্মরে 'অতিথির তরে অর্ঘ্য সাজায়ে আনো' ॥

নির্মম শীত তারি আয়োজনে এসেছিল বনপারে,
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি— মার্জনা নাহি কারে ।
ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত দূর করি দিল তারে ॥

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে ভরিতে নূতন করি,
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার পূর্ণের দান স্মরি ।
অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল নূতন চেতনা ভরি ॥

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে নব পরিচয় দিতে,
নবীন রূপের অপরূপ জাদু আনিবে সে ধরণীতে ।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয়মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নববর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে ফিরে জয় করে নিতে ॥

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা—
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা॥

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়'— কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থরথর করি উঠুক পরান প্রান্তরে পর্বতে॥

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়, 'করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে মধুপের মনোহরা!'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র কঠোর যতনভরে—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার জয়সংগীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার—
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর রিক্ত হবার তরে॥

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল, শূন্য কে দিল ভরি!
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে মাধুরীর মঞ্জরি।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায় জাগে শ্যামাসুন্দরী॥

[শান্তিনিকেতন]। দোলপূর্ণিমা। ২২ ফাল্গুন ১৩৩৩

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য—
হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ—
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়—
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্‌ড্রন্‌-গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়—
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিত কিরণে দীপ্ত।

[বাঙ্গালোর]
আষাঢ় ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো, তারে বোলো—
এত দিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।
বনের মন্দিরমাঝে তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান—

চক্ষে জল বহে যায়, নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ ॥

দেবতার বর
কত জন্ম, কত জন্মান্তর,
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে লিখিছে আকাশ-পাতে
এ দেখার আশ্বাস-অক্ষর !
অস্তিত্বের পারে পারে এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে ॥

বোলো আজি তারে—
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি আমার গুণ্ঠনখানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ—
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে প্রিয়তম—
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।'

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে!
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়— তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব— তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন-মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী— তুমি আছ, আমি আছি।

২১ শ্রাবণ ১৩৩৫

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে,
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায়—

শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গলজটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষুকটাক্ষচ্ছটায়॥

সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ন ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে॥

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে—
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধুলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার॥

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে, সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে॥

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী
'কী এনেছ' বলি।

পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত।

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে।
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষপরশে।
সহজসাধনলব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন—
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে সম্মান
তাই তব দান।

কলিকাতা
৪ ভাদ্র ১৩৩৫

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল,
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল—
তার পরে যদি তুমি ভোল
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দু দিকেই খোলা রবে দ্বার—
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাস যদি বেসো।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।

আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী,
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে—
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতিতলে।

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে,
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে—
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
মার্জনা কর যদি পাব তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল—
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তার বেশি দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি—
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে ?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ ?
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে ?
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ ?।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে ?
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে ;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, 'মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।'
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা—
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী!
উৎসবের বাঁশিখানি কেন যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মুলতানে—

তোমারে পরালো সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল ॥

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে—
'কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি
তীর-পানে চাহি।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে-নতা
তরুণী কন্যার পানে, তরী-'পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে।'

কোন্ টানে জানা হতে অজানায় চলে
আধো-হাসি আধো-অশ্রুজলে।
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
অচেনার ধারে।
ও পারের গ্রাম দেখো আছে ওই চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে—
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি
ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীরু তরী॥

জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিণী—
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
রেখে গেল তার।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগ যুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
বাধা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত—
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত॥

তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছালো আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, 'প্রাণ দিয়ে ভরা যায় বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ—
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,
যদি ব'লে যাও, বধূ, 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।' '

১৯ আশ্বিন ১৩৩৫

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে—
দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা।
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়,
পাখির সংগীত-সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা।

সৃষ্টির সে রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে—
দুজনায় গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙিন বসনে ওরা সেজে
চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে—
পুরানো সংসার হতে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন।

যাহা সব চেয়ে সত্য সব চেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুনকলোল্লাস।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্তের ম্লানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস।
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে—
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ॥

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত-নাচের-নেশা-পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরুগুলি ওই দেখ্ আছে কান পেতে,
ওই সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।
নিবি তোরা তীর্থবারি সে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিত সংগীত-উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মত্ত হাওয়া॥

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি,
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে—
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন॥

২০ আশ্বিন ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি। বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব; আমার বরণপুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে,
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্যবিস্তার
সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জগৃহদ্বার
এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতিসন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান! হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ লিখন—
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা! আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।

হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা— মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায়,
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।

আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর ; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণ-হীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে ; দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণনম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা-বলা।

২৭ পৌষ ১৩৩৫

প্রণাম

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা-বর্ণে-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে দোঁহে পেল পুলক দোঁহার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন-পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে,
তুলিল হিল্লোলদোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা— অধরার গেছি পিছুপিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্ত্রতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে

ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনামন্ত্র-জপে— আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম . যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর কোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা।
চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য-সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি— ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি, তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা-মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্য ক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি— এই মোর রহিল প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
৬ এপ্রিল ১৯৩১

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি— প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?॥

পৌষ ১৩৩৮

পত্রলেখা

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন—
কতমতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্কোখানি
আখরোট-কাঠ দিয়ে গড়া।

ছাপ-মারা চিঠির কাগজ
নানা বছরের।
রুপোর কাগজ-কাটা এনামেল-করা।
কাঁচি, ছুরি, গালা, লাল ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেন্সিল।
বলে গিয়েছিলে তুমি, চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে।

লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।
লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাই নে তো।
একটি খবর আছে শুধু—
তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারো তো জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি, এ কথাটি জানাই তোমাকে—
তুমি চলে গেছ।
যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে, এ খবর সহজ তো নয়।
আমি নই কবি;
ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে,
না থাকে চোখের চাওয়া।
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি।

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসি গে।

শেষবার এই লিখে যাই—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যত-কিছু
হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের 'পরে।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

মৃত্যুঞ্জয়

দূর হতে ভেবেছিনু মনে—
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রুকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে নাকি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?'
নামিল আঘাত।

এইমাত্র? আর-কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।

তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে॥

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব॥

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।

খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্ ধস্,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে-দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরী-নদীতীরে পিসিদের গ্রাম—
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

বর্ষা ঘনঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,

মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা—
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিনরাত, মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু—
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তার শখ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো-অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয়-ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়

সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া—
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫ আষাঢ় ১৩৩৯

জলপাত্র

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত
জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে

কেন এলে
কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে !
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে
আসিতেছিলাম ধেয়ে আপনার ঘরে।
চাহিলে তৃষ্ণার বারি—
আমি হীন নারী
তোমারে করিব হেয়,
সে কি মোর শ্রেয় !
ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, 'অপরাধী করিয়ো না মোরে।'

শুনিয়া, আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী ;
হাসিয়া কহিলে, 'হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা,
সেইমতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণ-রাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা ;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।

যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি

সেও কি অশুচি!

বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে

নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিসবৃষ্টিতে।'

জলভরা মেঘস্বরে এই কথা ব'লে

তুমি গেলে চলে।

তার পর হতে

এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে

নানা বর্ণে আঁকি,

নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।

হে মহান্, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ,

সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা-পানে করুক বহন।

৮ শ্রাবণ ১৩৩৮

পসারিনি

পসারিনি, ওগো পসারিনি,

কেটেছে সকালবেলা হাটে হাটে লয়ে বিকিকিনি।

ঘরে ফিরিবার খনে

কী জানি কী হল মনে

বসিলি গাছের ছায়াতলে,

লাভের জমানো কড়ি

ডালায় রহিল পড়ি,

ভাবনা কোথায় ধেয়ে চলে।

এই মাঠ, এই রাঙা ধূলি,

অঘ্রানের-রৌদ্র-লাগা চিক্কণ কাঁঠাল-পাতাগুলি,

শীতবাতাসের শ্বাসে
এই শিহরণ ঘাসে,
কী কথা কহিল তোর কানে!
বহুদূর নদীজলে
আলোকের রেখা ঝলে,
ধ্যানে তোর কোন্ মন্ত্র আনে।

সৃষ্টির প্রথম স্মৃতি হতে
সহসা আদিম স্পন্দ সঞ্চরিল তোর রক্তস্রোতে।
তাই এ তরুতে তৃণে
প্রাণ আপনারে চিনে
হেমন্তের মধ্যাহ্নের বেলা—
মৃত্তিকার খেলাঘরে
কত যুগ-যুগান্তরে
হিরণে হরিতে তোর খেলা।

নিরালা মাঠের মাঝে বসি
সাম্প্রতের আবরণ মন হতে গেল দ্রুত খসি।
আলোকে আকাশে মিশে
যে নটন এ নিখিলে
দেখ তাই আঁখির সম্মুখে,
বিরাট কালের মাঝে
যে ওঙ্কারধ্বনি বাজে
গুঞ্জরি উঠিল তোর বুকে।

যত ছিল ত্বরিত আহ্বান
পরিচিত সংসারের দিগন্তে হয়েছে অবসান।
বেলা কত হল তার

বার্তা নাহি চারি ধার,
না কোথাও কর্মের আভাস—
শব্দহীনতার স্বরে
খররৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে,
শূন্যতার উঠে দীর্ঘশ্বাস॥

পসারিনি, ওগো পসারিনি,
ক্ষণকাল-তরে আজি ভুলে গেলি যত বিকিকিনি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা—
অনন্তের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা॥

৫ মাঘ ১৩৩৮

পুষ্প

পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে, হে নারী, তোমার অপেক্ষায়
পল্লবচ্ছায়ায়।
তোমার নিশ্বাস তারে লেগে
অন্তরে সে উঠিয়াছে জেগে,
মুখে তব কী দেখিতে পায়॥

সে কহিছে, 'বহু পূর্বে তুমি আমি কবে একসাথে
আদিম প্রভাতে
প্রথম আলোকে জেগে উঠি
এক ছন্দে বাঁধা রাখী দুটি
দুজনে পরিনু হাতে হাতে॥

আধো-আলো-অন্ধকারে উড়ে এনু মোরা পাশে পাশে
প্রাণের বাতাসে।
একদিন কবে কোন্ মোহে
দুই পথে চলে গেনু দোঁহে,
আমাদের মাটির আবাসে॥

বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
নব নব দেশে।
যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে
ফিরিনু সে কী সন্ধান-তরে
সৃজনের নিগূঢ় উদ্দেশে॥

অবশেষে দেখিলাম, কত জন্মপরে নাহি জানি,
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজও আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী॥

তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল॥

কী যে বলে সেই সুর, কোন্ দিকে তাহার প্রত্যাশা—
জানি নাই ভাষা।
আজ, সখী, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি—
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।'

১১ মাঘ [১৩৩৮]

যাত্রা

রাজা করে রণযাত্রা ; বাজে ভেরি, বাজে করতাল ;
কম্পমান বসুন্ধরা ! মন্ত্রী ফেলি ষড়যন্ত্রজাল
রাজ্যে রাজ্যে বাধায় জটিল গ্রন্থি। বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার-ভাঁটায়। পণ্যপোত
ধায় সিন্ধুপারে-পারে। বীরকীর্তিস্তম্ভ হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানবকঙ্কালস্তূপে, ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চূড়া তার স্বর্গ-পানে হানে অট্টহাস। পণ্ডিতেরা
আক্রমণ করে বারম্বার পুঁথির-প্রাচীর-ঘেরা
দুর্ভেদ্য বিদ্যার দুর্গ ; খ্যাতি তার ধায় দেশে দেশে।

হেথা গ্রামপ্রান্তে নদী বহি চলে প্রান্তরের শেষে
ক্লান্ত স্রোতে। তরীখানি তুলি লয়ে নববধূটিরে
চলে দূর পল্লি-পানে। সূর্য অস্ত যায়। তীরে তীরে
স্তব্ধ মাঠ। দুরু দুরু বালিকার হিয়া। অন্ধকারে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় দিগন্তের ধারে।

১২ মাঘ [১০৩৮]

দ্বিধা

বাহিরে যার বেশভূষার ছিল না প্রয়োজন,
হৃদয়তলে আছিল যার বাস,
পরের দ্বারে পাঠাতে তারে দ্বিধায় ভরে মন—
কিছুতে হায়, পায় না আশ্বাস!
সবুজ-বনে নীল-গগনে মিশায় রূপ সবার সনে,
পাখির গানে পরায় যারে সাজ,
ছিন্ন হয়ে সে ফুল একা আকাশহারা দিবে কি দেখা
পাথরে-গাঁথা প্রাচীর-মাঝে আজ ?।

চন্দনের গন্ধজলে মুছালো মুখখানি
নয়নপাতে কাজল দিল আঁকি।
ওষ্ঠাধরে যতনে দিল রক্তরেখা টানি,
কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।
ভূষণ যত পরালো দেহে তাহারি সাথে ব্যাকুল স্নেহে
মিলিল দ্বিধা, মিলিল কত ভয়।
প্রাণে যে ছিল সুপরিচিত তাহারে নিয়ে ব্যাকুল চিত
রচনা করে চোখের পরিচয়।

১৩ মাঘ [১৩১

ছায়াসঙ্গিনী

কোন ছায়াখানি
সঙ্গে তব ফেরে লয়ে স্বপ্নরুদ্ধ বাণী,
তুমি কি আপনি তাহা জানো?
চোখের দৃষ্টিতে তব রয়েছে বিছানো
আপনা-বিস্মৃত তারি
সঞ্চিত স্তিমিত অশ্রুবারি।

একদিন জীবনের প্রথম ফাল্গুনী
এসেছিল, তুমি তারি পদধ্বনি শুনি
কম্পিতকৌতুকী
যেমনি খুলিয়া দ্বার দিলে উঁকি,
আম্রমঞ্জরির গন্ধে মধুপগুঞ্জনে
হৃদয়স্পন্দনে
এক ছন্দে মিলে গেল বনের মর্মর।
অশোকের কিশলয়স্তর
উৎসুক যৌবনে তব বিস্তারিল নবীন রক্তিমা
প্রাণোচ্ছ্বাস নাহি পায় সীমা

তোমার আপনা-মাঝে—
সে প্রাণেরই ছন্দ বাজে
দূর নীলবনান্তের বিহঙ্গসংগীতে,
দিগন্তে নির্জনলীন রাখালের করুণ বংশীতে।
তব বনচ্ছায়ে
আসিল অতিথি পান্থ, তৃণস্তরে দিল সে বিছায়ে
উত্তরী-অংশুকে তার সুবর্ণ পূর্ণিমা,
চম্পকবর্ণিমা।
তারি সঙ্গে মিশে
প্রভাতের মুক্ত রৌদ্র দিশে দিশে
তোমার বিধুর হিয়া
দিল উচ্ছ্বসিয়া॥

তার পর সসংকোচে বন্ধ করি দিলে তব দ্বার,
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে উদ্দামকুন্তলভার
লইলে সংযত করি—
অশান্ত তরুণ প্রেম বসন্তের পথ অনুসরি
স্খলিতকিংশুক-সাথে
জীর্ণ হল ধূসর ধূলাতে॥

তুমি ভাবো সেই রাত্রি দিন
চিহ্নহীন,
মল্লিকাগন্ধের মতো,
নির্বিশেষে গত।
জান না কি যে বসন্ত সঞ্চরিল কায়া
তারি মৃত্যুহীন ছায়া
অহর্নিশি আছে তব সাথে সাথে
তোমার অজ্ঞাতে?
অদৃশ্য মঞ্জরি তার আপনার রেণুর রেখায়

মেশে তব সীমন্তের সিন্দুরলেখায় ;
সুদূর সে ফাল্গুনের স্তব্ধ সুর
তোমার কণ্ঠের স্বর করি দিল উদাত্ত মধুর।
যে চাঞ্চল্য হয়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর॥

[? মাঘ ১৩৩৮]

পুকুর-ধারে

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টল টল করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমিশাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙ্গন, একটি শিউলি ;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো।
বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ও পারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান ;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো, গা-খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাতে—
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে॥

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে—
টলমল করছে পুকুরের জল,
ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাবিলেবুর পাতা ॥

চেয়ে দেখি আর মনে হয়—
এ যেন আর-কোনো একটা দিনের আবছায়া,
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে;
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে,
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে—
তখন দোয়েল ডাকে সজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুর-ঝোপে।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না,
কপাট অল্প একটু ফাঁক ক'রে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ॥

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

ক্যামেলিয়া

নাম তার কমলা
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা—
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।

মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হল না॥

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই,
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,
প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে—
প্রায়ই হয় দেখা।
মনে মনে ভাবি, আর-কোনো সম্বন্ধ না থাক্‌,
ও তো আমার সহযাত্রিণী।
নির্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্‌ করছে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।
মনে ভাবি, একটা-কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন,
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি—
রাস্তার মধ্যে একটা-কোনো উৎপাত,
কোনো-একজন গুণ্ডার স্পর্ধা।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়োরকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে,
না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাঁসের॥

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়,
কমলার পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল, অকারণে, টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে—
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।

কোনো ছুতো পাই নে, হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে।
এমন সময় সে এক মোটা চুরট ধরিয়ে
টানতে করলে শুরু।
কাছে এসে বললুম, 'ফেলো চুরট।'
যেন পেলেই না শুনতে,
ধোঁওয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম চুরট রাস্তায়।
হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকালো কট্‌মট্‌ করে,
আর-কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল-খেলায়,
বেশ একটু ওড়াগোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নিচু করে ভান করলে পড়বার।
হাত কাঁপতে লাগল,
কটাক্ষেও তাকালে না বীরপুরুষের দিকে।
আপিসের বাবুরা বললে, 'বেশ করেছেন মশায়!'
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।

পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না;
তৃতীয় দিনে দেখি,
একটা ঠেলাগাড়িতে চলেছে কলেজে।
বুঝলুম, ভুল করেছি গোঁয়ারের মতো,
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না।
আবার বললুম মনে মনে,

ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা—
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে
ঠাট্টার মতো।
ঠিক করলুম ভুল শোধরাতে হবে।

খবর পেয়েছি, গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার।
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে, গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড়।
শোনা গেল, আসবে না এবার।
ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা—
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।
সে বললে, 'তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে।'
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু—
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক, আহারে ততটা নয়।
ফুটবলের সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি—
মনে করলে, আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া।
হায় রে ভাগ্যের খেলা।

যেদিন নেমে আসব তার দুদিন আগে তনুকা বললে,
'একটি জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা-
একটি ফুলের গাছ।'
এ এক উৎপাত। চুপ করে রইলেম।

তনুকা বললে, 'দামি দুর্লভ গাছ,
এ দেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে।'
জিগেস করলেম, 'নামটা কী ?'
সে বললে, 'ক্যামেলিয়া।'
চমক লাগল—
আর-একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।
হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না ?'
তনুকা কী বুঝলে জানি নে— হঠাৎ লজ্জা পেলে, খুশিও হল।

চললেম টব-সুদ্ধ গাছ নিয়ে।
দেখা গেল, পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কামরা গাড়িতে
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক আরো মাস-কয়েকের তুচ্ছতা।

পুজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠল
সাঁওতাল-পরগনায়।
জায়গাটা ছোটো। নাম বলতে চাই নে,
বায়ুবদলের বায়ু-গ্রস্ত-দল এ জায়গার খবর জানে না।
কমলার মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।
এইখানে বাসা বেঁধেছেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়।
নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হর্তুকিগাছের তলায়—

পুনশ্চ

উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।

বাসাবাড়ি কোথাও নেই—
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল সেই ক্যামেলিয়া॥

কমলা এসেছে মাকে নিয়ে।
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শালবাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে,
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে—
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে?
অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে
পেরিয়ে যায় ও পারে,
সেখানে সিসুগাছের তলায় বই পড়ে।
আর, আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না ব'লেই।
একদিন দেখি নদীর ধারে বালির উপর ওদের চড়িভাতি।
ইচ্ছে হল গিয়ে বলি,
আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই?
আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে,
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে—
আর, তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না?।

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক—
শর্ট্ পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,
কমলার পাশে পা ছড়িয়ে হাভানা চুরট খাচ্ছে।

আর, কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে
শ্বেতজবার পাপড়ি।
পাশে পড়ে আছে বিলিতি মাসিক পত্র।

মুহূর্তে বুঝলেম এই সাঁওতাল-পরগনার নির্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত, ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
সমস্ত দিন বন্দুক-ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোল কতদূর।

সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে—
তার হাত দিয়ে পাঠাব শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেক্‌টিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টি সুরে আওয়াজ এল,
'বাবু, ডেকেছিস কেনে?'
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে?'
আমি বললেম, 'এইজন্যেই।'
তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর-দশেক,
পরের ঘরে মানুষ,
যেমন ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলো বালি—
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে,
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ।

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভিরমি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না,
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র,
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,

দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল—
বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।
বেলা দুপুর।
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে—
তলায় পাতা ছড়িয়ে শ্যাওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে॥

ছেলেটার খেয়াল গেল ওইখানে ডুব দিতে—
ওই সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
কী আছে দেখিই-না, সব-তাতে এই তার লোভ।
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে খাবি খেয়ে তলিয়ে গেল কোথায়!
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে,
তখন সে নিঃসাড়।
তার পরে অনেক দিন ধরে মনে পড়েছে
চোখে কী করে সর্ষেফুল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচিবেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।

ভারি মজা—
কী ক'রে মরে সেই মস্ত কথাটা।
সাথিকে লোভ দেখিয়ে বলে,
'একবার দেখ্-না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে।'
ভারি ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে।
সাথি রাজি হয় না,
ও রেগে বলে, 'ভীতু, ভীতু, ভীতু, কোথাকার!'

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো।
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি।
বাড়ির লোকে বলে, 'লজ্জা করে না বাঁদর!'
কেন লজ্জা!
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,
গাছের ডাল যায় ভেঙে, ফল যায় দ'লে—
লজ্জা করে না?।

একদিন পাকড়াশিদের মেজোছেলে একটা কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বললে, 'দেখ্-না ভিতর-বাগে।'
দেখলে নানা রঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বললে, 'দে-না, ভাই, আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক,
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা করে,
আর দেব আমের কষির বাঁশি।'

দিল না ওকে।

কাজেই চুরি করে আনতে হল।
ওর লোভ নেই,
ও কিছু রাখতে চায় না, দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে।
খোদনদাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বললে,
'চুরি করলি কেন!'
লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে, 'ও কেন দিল না?'
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের।

ভয় নেই, ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে।
কোলা ব্যাঙ তুলে ধরে খপ্‌ ক'রে—
বাগানে আছে খোঁটা পোঁতার এক গর্ত
তার মধ্যে সেটা পোষে,
পোকামাকড় দেয় খেতে।
গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি—
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালি।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে—
ভাবলে, 'দেখিই-না কী করে মাস্টারমশায়।'
ডেস্কো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা—
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবের মতো,
ব্যবহারটাও।

অন্ন জুটত না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া—
সেই অপকর্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।
আর, সেইসঙ্গেই কোন্ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তাদের শসাক্ষেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।
একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনোদিন জল বেরোয় নি যে ছেলের চোখে
দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,
মুখে অন্নজল রুচল না—
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করমচা,
চুরি করতে উৎসাহ হল না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগনে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি—
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ধানিকলের বাঁশি॥

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে 'দূর দূর' করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানি।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল—
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত,
ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ওইরকম চ্যাপটা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্যি এই গয়লানি মাসির 'পরে।
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে—

'দেখি-না কী হয়' তারই বিবিধরকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানির স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ওই ছেলেটারই।

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল,
'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি !
পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে রেখে দেয়—
বলে, ইঁদুরে কেটেছে।
এতবড়ো বাঁদর !'
আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই।
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে—
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডি !'

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি—
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি,
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে—
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে!
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে—
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো, তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল, কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।

চিঠিপত্র পাই কখনো বা।

মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,

এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!

আর, তারা কি সবাই অসামান্য—

এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা!

আর, তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে

স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল্'এর চিঠিতে লিখেছে,

লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে—

(বাঙালি কবির কবিতা ক' লাইন দিয়েছে তুলে,

সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।)

তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি—

সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,

আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।

লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,

'এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চ'লে—

ঝিনুকের দুটি খোলা,

মাঝখানটুকু ভরা থাক্

একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—

দুর্লভ, মূল্যহীন।'

কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গী!

সেইসঙ্গে নরেশ লিখেছে,

'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,

কিন্তু চমৎকার—

হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়?'

বুঝতেই পারছ

একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো, নাহয় তাই হল,
নাহয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু, তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে—
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ওই নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই।
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে ?
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লন্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু, ওইখানেই যদি থামো
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক,
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা—
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে ;
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে

ধরা পড়ুক তার রহস্য— মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ, জর্মান, ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্যে সভা ডাকা হোক-না—
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকা।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি—
সবাই বলছে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে ব'লে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বলতে হল নিজের মুখেই—
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটে নি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর, তার পরে ?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল।
স্বপ্ন আমার ফুরোল।
হায় রে সামান্য মেয়ে,
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়।

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন চষা-ক্ষেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় ;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা সাঁওতাল-পাড়া ,
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে,
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায় ।
হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ—
দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা ।
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়—
তারই এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
মাটি গেছে ক্ষ'য়ে,
দেখা দিয়েছে
ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড় ,
মাঝে মাঝে মর্চে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো ;
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে রচনা করেছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড় ;
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী ॥

শরৎকালে পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—
তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে

রোহিতসমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে
রুষ্ট রুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মতো—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল-সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
'হায় হায়' রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।
ক্রন্দিত আকাশের নীচে ওই ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

এসেছিনু বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝিরুঝিরু ঝর্নার ধারায়
রচনা করেছি মনগড়া রহস্যকথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুরবেলায় আপন-মনে একলা।

তার পরে অনেক দিন হল,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ওই আকাশের তলায়, ভাঙা মাটির ধারে,

ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।
এই শালবন, এই একলা স্বভাবের তালগাছ,
ওই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙা মাটির মিতালি—
এর পানে অনেক দিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-গানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চ'লে।
আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ও পার থেকে—
তার পরে ?
তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ওই বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের ক্ষেত,
পুব দিকের মাঠে চরবে গোরু।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা।

৩০ শ্রাবণ ১৩৩৯

শেষ চিঠি

মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েছে আমার,
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই—

হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদুনে॥

অমলির ঘরে ঢুকতে পারি নি বহুদিন,
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ করে—
তাই খুললেম ঘরের তালা।
একজোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি।
শেল্‌ফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।
একটা এল্‌বাম—
ছবি কেটে কেটে জুড়েছে তার পাতায়।
আলনায় তোয়ালে, জামা,
খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাচের আলমারিতে
নানা রকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো॥

চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে, টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে—
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।
ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমারই ঠিকানা লেখা
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে।

শুনেছি ডুবে মরবার সময়

অতীত কালের সব ছবি
এক মুহূর্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—
চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে।

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাত বছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে
ও বুঝি বাঁচবে না বেশিদিন।
কেননা, বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকালবিচ্ছেদের ছায়া
ভাবী কাল থেকে উল্‌টে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হত না ওকে সঙ্গছাড়া করি।
কাজ করছি আপিসে বসে,
হঠাৎ হত মনে
যদি কোনো আপদ ঘটে থাকে।

বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে—
বললে, 'মেয়েটার পড়াশুনো হল মাটি—
মূর্খ মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে ?'
লজ্জা পেলেম কথা শুনে ;
বললেম, 'কালই দেব ভর্তি করে বেথুনে।'

ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে।
কতদিন স্কুলের বাস্‌ অমনি যেত ফিরে।
সে চক্রান্তে বাপেরও ছিল যোগ।

ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে ;
বললে, 'এমন করে চলবে না।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে—
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে।'
মাসির সঙ্গে গেল চলে।
অশ্রুহীন অভিমান নিয়ে গেল বুক ভ'রে
যেতে দিলেম ব'লে ॥

বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়,
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে।
চার মাস খবর নেই।
মনে হল, গ্রন্থি হয়েছে আলগা গুরুর কৃপায়।
মেয়েকে মনে-মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে—
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা ॥

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশীতে,
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি…
কী আর বলব,
দেবতাই তাকে নিয়েছে ॥

যাক সে-সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা,
'তোমাকে দেখতে বড্‌ডো ইচ্ছে করছে।'…
আর কিছুই নেই।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৯

ছুটির আয়োজন

কাছে এল পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘের আলস্য—
দেখে, মন লাগে না কাজে॥

মাস্টারমশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা।
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়,
ছবি দেখে আপন মনে—
কমলদিঘির ফাটল-ধরা ঘাট,
আর ভঞ্জদের পাঁচিল-ঘেঁষা
আতাগাছের ফলে-ভরা ডাল।
আর দেখে সে মনে-মনে, তিসির ক্ষেতে
গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে
রাস্তা গেছে এঁকে বেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে।

কলেজের ইকনমিক্‌স্‌-ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র
হালের লেখা কোন্ উপন্যাস কিনতে হবে,
ধারে মিলবে কোন্ দোকানে—
'মনে রেখো' পাড়ের শাড়ি
সোনায়-জড়ানো শাঁখা,

দিল্লির কাজ-করা লাল মখমলের চটি
আর চাই রেশমে-বাঁধাই-করা
এণ্টিক-কাগজে-ছাপা কবিতার বই—
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না ॥

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড় না মাদুরা,
না ড্যাল্‌হৌসি কিম্বা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ ?।

আর দেখছি, সামনে দিয়ে স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়ি-বাঁধা ছাগল-ছানা পাঁচটা-ছটা ক'রে ,
তাদেব নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন করে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে বাঁধব না আজ তোড়ায়—
রঙ-বেরঙের সুতোগুলো থাক্‌,
থাক্‌ পড়ে ওই জরির ঝালর ॥

শুনে ঘরের লোকে বলে,
'যদি না বাঁধো জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী করে—

ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে ?'

আমি বলি,
'আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্নে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি,
তাই নিয়ে খুশি থাকো।'

বন্ধু বললে,
'এলেম তোমার ঘরে
ভরা-পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি খেপার মতো বললে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা।
আতিথ্যের ত্রুটি ঘটাও কেন ?'
আমি বলি, 'চলো-না ঝর্নাতলায়,
ধারা সেখানে ছুটছে আপন খেয়ালে—
কোথাও মোটা, কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোলো গুহার মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্বরের মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো—
কাকে ধরতে চায় ওই জলের ঝিকিমিকির মধ্যে !'

সভার লোকে বললে,

'এ যে তোমার আবাঁধা বেণীর বাণী—

বন্দিনী সে গেল কোথায় ?'

আমি বলি, 'তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে ;

তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,

চমক দিচ্ছে না চুনি-বসানো কঙ্কণে।'

ওরা বললে, 'তবে মিছে কেন ?

কী পাব ওর কাছ থেকে ?'

আমি বলি, 'যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে

ডালে-পালায় সব মিলিয়ে।

পাতার ভিতর থেকে তার রঙ দেখা যায় এখানে সেখানে,

গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপ্‌টায়।

চার দিকের খোলা বাতাসে দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।

মুঠোয় ক'রে ধরবার জন্যে সে নয়,

তার অসাজানো আটপহরে পরিচয়কে

অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে

তার আপন স্থানে।'

তুমি প্রভাতের শুকতারা

তুমি প্রভাতের শুকতারা

আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে

কখনো বা তুমি দেখা দাও

গোধূলির দেহলিতে,

এই কথা বলে জ্যোতিষী।

সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে

রক্ত অবগুণ্ঠনের নীচে

শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার আলো

সাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।
সুপ্তিসমুদ্রের এ পারে ও পারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।
যখন নিভৃতপুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে
গোপনে রেখেছ তার 'পরে
স্বরলোকের সম্মতি,
ইন্দ্রাণীর মালার একটি পাপড়ি—
তোমাকে এমনি ক'রেই জেনেছি
আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ।
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান্,
তুমি মহিমান্বিত;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে,
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।
যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর—

সেখানে লক্ষকোটি বৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।
আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবিচিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী,
সেই মুহূর্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।
তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে
আমাদের নিমন্ত্রণ নেই—
আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মান্‌বই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলিফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানবপথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে—
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে॥

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।
হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের-কাজ-করা মেজে;
তার উপরে খানদুয়েক মাদুর পাতা।
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে মিটমিটে আলোয়।
বুড়ো মোহনসর্দার—
কলপ-লাগানো চুল বাব্‌রি-করা,
মিশ-কালো রঙ,
চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।
আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের-হাওয়া-লাগা ঝাউডালের মতো
দুলছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো,
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।

পাশের বাড়ি থেকে কুকুর ডেকে উঠল অকারণে।
নটার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।
অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো ব'লে পাঠালো চরের মুখে—
'নমো নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।'
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।

রাজার খাজনা-বাকির দায়ে বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে,
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ করে দেয় রঘু।
বলে, 'অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,
কিছু হাল্কা হোক তার বোঝা।'

একদিন তখন মাঝ-রাত্তির—
ফিরছে রোঘো লুটের মাল নিয়ে,
নদীতে তার ছিপের নৌকো
অন্ধকারে বটের ছায়ায়।

পথের মধ্যে শোনে,
পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি।
বর ফিরে চলেছে বচসা করে;
কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।
এমন সময় পথের ধারে
ঘন বাঁশবনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল— রে রে রে রে রে রে।

আকাশের তারাগুলো
যেন উঠল থরথরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পাল্‌কি পড়ল পথের মধ্যে ;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা,
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না—
'দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।'
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পাল্‌কি থেকে টেনে বের করলে বরকে,
বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁখ উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি,
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়ালো সভায়
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেল-মাখা সর্বাঙ্গ,
মুখে ভুষোর কালী।
বিয়ে হল সারা।
তিন পহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত,
'তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো
স্মরণ কোরো রঘুকে।'

তার পরে এসেছে যুগান্তর।

বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চ'লে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে

পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর ব'সে কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চড়ে চলেছে কাল;
পদাতিক পথিক চলতে চলতে পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয়,
পান সারা হলে পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে,
চাকার তলায় ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই-যে লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে,
না আছে কারও স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;
তার সেদিনকার কান্নাহাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।
তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখি নে ধুলোর 'পরে।
সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ-মেলে-চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড় ;
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এ দিক থেকে ও দিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল এক গোত্রের।

সে কয় দিনের জন্মদিন একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কালসমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যুষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।
সেই শুনে কোনো-কোনোদিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো-কোনো দূতীকে
পলাশবনের রঙ-মাতাল ছায়াপথে
কাজ ভোলানো সকাল-বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি—
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষরেখায় জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর বেদনা;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।
তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের

প্রথম-ঘুম-ভাঙা প্রভাতে
নতুন-ফোটা বেলফুলের মালা ;
ভোরের স্বপ্ন
তারই গন্ধে ছিল বিহ্বল ।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোরজগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে ।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলো চুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে
সোনার কাঠির পরশ লেগে ।

দিন গেল ।
সেই বসন্তী রঙের পঁচিশে বৈশাখের
রঙ-করা প্রাচীরগুলো পড়ল ভেঙে ।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে ।
সেদিনকার কিশোরক সুর সেধেছিল যে একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল তারের পর নতুন তার ।

সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।
বেলা-অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝ দরিয়ায়—
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে কেউ বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা—
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র।
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে,
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে।
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে বেঁধে দিয়েছে সুর—
পঁচিশে বৈশাখকে বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।

তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজও আছে
আমার গানে, আমার বাণীতে ॥

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরি।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায় পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে
সংগীতে পরুষকোলাহলে
আলোড়িত
তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে ॥

এই দুর্গমে, এই বিরোধসংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।

জেনেছ কি—
আমার প্রকাশে অনেক আছে অসমাপ্ত,
অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, অনেক উপেক্ষিত ?

অন্তরে বাহিরে সেই
ভালো-মন্দ স্পষ্ট-অস্পষ্ট খ্যাত-অখ্যাত
ব্যর্থ-চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায় আজ প্রতিফলিত—
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার ক'রে—
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে—
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

পাঠিকা

বহিছে হাওয়া উতল বেগে,
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে,
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ, পরি নি বেশ,
গিয়েছে বেলা, বাঁধি নি কেশ—
পড়ি তোমারই লেখা।

ওগো আমারই কবি,
তোমারে আমি জানি নে কভু,
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।
বাদল-ছায়া হায় গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি,
নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বলো।

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি—
কোন্ সে তব প্রিয়া!
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী—
জানি তাহারে তুলেছ রচি
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতি-মাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি।

নারীহৃদয়-যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান—
বিনা কারণে দুলিয়া ওঠে প্রাণ।

নাই বা তার শুনিনু নাম,
কভু তাহারে না দেখিলাম
কিসের ক্ষতি তায়!
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায়।

ওগো আমার কবি,
সুদূর তব ফাগুন-রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি—
চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি।
জেনেছ যারে তাহারও মাঝে
অজানা যেই সেই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে,
তোমার মালা এল আমার গলে।

বৃষ্টি-ভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণসাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি
গন্ধ তারই স্বপ্নসম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরই।

ওগো আমার কবি,
জান না তুমি মৃদু কী তানে
আমারই এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।
ঘটে নি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে—
আপন-ভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারই গভীর বিস্মৃতি ॥

শান্তিনিকেতন
বৈশাখ ১৩৪১

ভুল

সহসা তুমি করেছ ভুল গানে,
বেধেছে লয় তানে,
স্খলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা—
শরমে তাই মলিন মুখ নত
দাঁড়ালে থতোমতো,
তাপিত দুটি কপোল হল রাঙা।
নয়নকোণ করিছে ছলোছলো,
শুধালে তবু কথা কিছু না বল—
অধর থরোথরো,
আবেগভরে বুকের 'পরে মালাটি চেপে ধর ॥

অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনাভরা ত্রুটির মাঝখানে।

নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।
একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।

তৃষিত হয়ে ওইটুকুরই লাগি
আছিল মন জাগি,
বুঝিতে তাহা পারি নি এতদিন।
গৌরবের গিরিশিখর-'পরে
ছিলে যে সমাদরে
তুষারসম শুভ্র স্থকঠিন।
নামিলে নিয়ে অশ্রুজলধারা
ধূসর ম্লান আপন-মান-হারা
আমারও ক্ষমা চাহি—
তখনি জানি আমারই তুমি, নাহি গো দ্বিধা নাহি

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।
অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো—

আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে ॥

৬ বৈশাখ ১৩৪১

উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ—
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতা-পানে আঁখি অন্ধ ছিল ॥

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার-বরন ফল খসিয়া পড়ে—
কহিনু, 'ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ।'
হায় রে তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল ॥

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।
তারার আলোক-সাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল ॥

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন—
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল ॥

কে বোঝে কাহার মন ! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া ।
আশা ছিল, কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত—
বুঝি-বা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল ॥

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি ।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ—
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল ?।

শান্তিনিকেতন
৯ শ্রাবণ ১৩৪১

নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে যেন এক কালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে 'প্রেয়সী' অথবা 'প্রিয়ে' ।
এ কালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম—
থাক্‌ সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে ।
তুমি দাবি কর কবিতা আমার কাছে
মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা ।
সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়—
যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে—

সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।
গৌরবরন তোমার চরণমূলে
ফলসাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো—
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘনকালো।
একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে-কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে,
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে।
বৈকালে-গাঁথা যূথীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে,
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারই দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল
রক্তে-জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে,
তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কই।
এ কালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি-রুমাল-টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।

গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়—
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা—
জানি অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।
তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ-পান্তোয়া
মাছ-মাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।
বুঝি অনুমানে চোখে কৌতুক ঝলে,
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা—
এ-সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফর্মাশ করা।
আচ্ছা, নাহয় ইঙ্গিত শুনে হেসো,
বরদানে, দেবী, নাহয় হইবে বাম—
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে-

স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষ-ডালের ফাঁকে।
তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা—
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে!
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে॥

মনে ছবি আসে— ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি—
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো,
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে—
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়েমালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি,
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে—
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি?
আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি—
গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি—
শব্দটি নেই, ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে।

ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি।
কতদিন হল গিয়েছ ভাবিব না তা,
শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।
মনে আসে, তুমি পুব জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে—
উৎসুক চোখে বুঝি আশা কর কারে,
আল্‌গা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া,
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া॥

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন্‌।
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌনমাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা॥

চন্দননগর
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

জলেস্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মরণের মুখে
প্রতি মুহূর্তে প্রমাণিত হয় বিজয়ী প্রাণের অভিনয়।

তোমার শ্রেষ্ঠসুন্দর মহিমার কাছে
আজ রেখে যাব আমার দীর্ঘজীবনের প্রণতি।
এই তোমার মাটি,
তার অন্তরের তলায় তলায় বিচিত্র মিলেছে
বিচিত্র প্রাণ, বিচিত্র মৃত্যু;
তাকে আজ আমি স্পর্শ করি,
অনুভব করি সর্বদেহমনে
সকল অনুভূতির ভার তুমি মোর মাঝে।
তোমার এই মাটি,
অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষ
দেহ মিলিয়েছে তার ধূলায়;
কয় মুঠো সঞ্চিত রেখে যাব
দেহ পাত্রের শেষটুকু,
এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে॥

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্ন পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা,

যেমন আমাদের ভয়ভাবনায় তোমার অন্যমনস্কেই
ঘুমন্ত প্রভাত সূর্য প্রতিদিন মুছে দেয় শিশির বিন্দু,
তার কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য/ অপ্রসন্ন হিংস্রে বলে
বলে যায় অলক্ষিত বাণী — "আমি আছি।"
ফুলহীন ফলহীন পত্রহীন
আতপ্তশুষ্ক তোমার মরুক্ষেত্রে
মরীচিকার প্রেতনৃত্যের বিদ্রূপভঙ্গী।
তোমার মেরু-কারাগারে
অনন্ত তুষারশিলার শৃঙ্খলে বন্দীকৃত
দিন ও রাত্রি আকাশ প্রদক্ষিণ করে
নিঃশব্দ নিরানন্দ নির্বাক।
স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে
তুমি বেরিয়ে এসেছিলে সংখ্যাগণনাতীত প্রত্যুষে;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
ভাঙা ইতিহাসের অর্থহীন অবশেষ;
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার আবর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।
জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার ছোটো ছোটো খণ্ডকালের পিঞ্জরে,
তারি মধ্যে সব খেলা হয় শেষ,
সব কীর্তি হয় বিলুপ্ত।
আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে,
এত দিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবী করব না তোমার দ্বারে।

আমার সমস্ত বিস্তৃত দেশের সুখদুঃখবিচিত্র দান
যে নিঃশব্দ তুলি উন্মীলিত বিমীলিত হতে থাকে
তারি এক অংশে জেগে একটি অসামান্য
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের প্রান্তে একটি মানবের মধুরে
যদি কভু করে থাকি পরমদুঃখে,
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক
আমার কপালে;
সে যাবে মিলিয়ে,
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ অক্টোবর
১৯৩৫

পৃথিবী

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে ।

মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে ।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার ।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য, কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে ।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক ।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি—
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা ।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে ।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়—
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ় ।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে ।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা ।

দেবতা এলেন পরযুগে, মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের—
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা—
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে—
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।

শুভে-অশুভে-স্থাপিত তোমার পাদপীঠে
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর, গুপ্তসঞ্চার তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি— উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয়-মুষ্টি ধূলি, আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম-
রেখে যাব এই নামগ্রাসী আকারগ্রাসী সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপকধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
'আমি আনন্দিত'।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়—
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে,
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো

আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ আম্রমুকুলের গন্ধে,
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে স্বর্গীয় মদের ফেনা;
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে

সংখ্যাগণনার-অতীত প্রত্যুষে ;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ ;
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে,
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান॥

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে.
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান্ খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে,
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

শান্তিনিকেতন
১৬ অক্টোবর ১৯৩৫

উদাসীন

ফাল্গুনের রঙিন আবেশ
যেমন দিনে দিনে মিলিয়ে দেয় বনভূমি
নীরস বৈশাখের রিক্ততায়
তেমনি করেই সরিয়ে ফেলেছ, হে প্রমদা, তোমার মদির মায়া
অনাদরে অবহেলায়।
একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে আমার সাকি,
পাত্র উজাড় ক'রে
দ্রাক্ষারসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায়।
আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে,
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে;
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই,
নেই সেই নীরব সুরের ঝংকার
যা আমার নামকে দিয়েছিল রাগিণী।

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ!
কেন ক্লান্ত হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে!
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—

ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী ॥

সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।
দুঃখ এই যে, এতে দুঃখ নেই তোমার মনে।
একদিন নিজেকে নূতন নূতন করে সৃষ্টি করেছিলে, মায়াবিনী,
আমারই ভালো-লাগার রঙে রঙিয়ে।
আজ তারই উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা—
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।
ভুলে গেছ— যতই দিতে এসেছিলে আপনাকে
ততই পেয়েছিলে আপনাকে বিচিত্র ক'রে।
আজ আমাকে বঞ্চিত ক'রে বঞ্চিত হয়েছ আপন সার্থকতায়।
তোমার মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ রইল আমার মনের স্তরে স্তরে—
সেদিনকার তোরণের স্তূপ, প্রাসাদের ভিত্তি,
গুল্মে-ঢাকা বাগানের পথ ॥

আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।
আর, তুমি আছ
আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে—
পিপাসিতের জন্যে জল নেই সেখানে,
পিপাসাকে ছলনা করতে পারে
নেই এমন মরীচিকারও সম্বল ॥

শান্তিনিকেতন
ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

তোমার অন্যযুগের সখা

ওগো তরুণী,
ছিল অনেক দিনের পুরোনো বছরে
এমনি একখানি নতুন কাল
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত,
সেই কালেরই আমি।
মুছে-আসা ঝাপসা পথ বেয়ে
এসে পড়েছি বনগন্ধের সংকেতে
তোমাদের এই আজকে-দিনের নতুন কালে।
পারো যদি মেনে নিয়ো আমায় সখা ব'লে।
আর কিছু নয়, আমি গান যোগাতে পারি
তোমাদের মিলনরাতে—
আমার সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান,
তার সুরে পাবে দূরের নতুনকে,
তোমার লাগবে ভালো,
পাবে আপনাকেই
আপনার সীমানার অতীত পারে।
সেদিনকার বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয়বন্দনার তান
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
সে নিয়ো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখের পাতায়,
তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে।

আমার বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু
ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধের মতো
রেখে দিয়ে যাব তোমার নববসন্তের হাওয়ায়।

সেদিনকার ব্যথা অকারণে বাজবে তোমার বুকে ;
মনে বুঝবে সেদিন তুমি ছিলে না, তবু ছিলে—
নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে,
যবনিকার ও পারে।

ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।
হে তরুণী, আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সখা ব'লে—
তোমার অন্তযুগের সখা।

শান্তিনিকেতন
১৯ বৈশাখ ১৩৪৩

আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'—
সুন্দর হল সে।

তুমি বলবে এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব এ সত্য,
তাই এ কাব্য।

এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকারপটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
না, না, না—
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ,
না আমি, না তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমি'র গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে।

একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমি'র রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রং।

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে
মর্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,

গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালী।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
'তুমি সুন্দর',
'আমি ভালোবাসি'।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগ যুগান্তর ধ'রে—
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন
'কথা কও' 'কথা কও',
বলবেন 'বলো তুমি সুন্দর',
বলবেন 'বলো আমি ভালোবাসি' ?।

শান্তিনিকেতন
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

বাঁশিওয়ালা

'ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম'—
এই ব'লে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি,
মনে আছে তো ?।

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে,
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি—
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকোয়—
চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ও পারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ ;
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে ;
দুই হাত বাড়িয়ে দিই
নাগাল পাই নে কিছুই কোনো দিকে॥

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ার-জলের দিকে চেয়ে—
ভেসে যায় মুক্তিপারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,

ভেসে যায় চলতি বেলার আলোছায়া।
এমন-সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে,
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ॥

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চম রাগে
দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—
যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদী
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণিমাতন॥

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,
পাঁজরের-উপরে-আছাড়-খাওয়া
মরণসাগরের ডাক,
ঘরের-শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি—
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।

অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর-ঘূর্ণি-মার-খাওয়া অরণ্যের বকুনি ।

ডানা দেয় নি বিধাতা—
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি ।

ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে,
সবাই বলে 'ভালো' ।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,
ঝাপট লাগে মাথার উপর—
ধুলোয় লুটোই মাথা ।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত ক'রে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা,
কঠিন করে জানি নে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে ।

বাঁশিওয়ালা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি,
ডাক পড়ে অমর্তলোকে,
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা ।
সেখানে কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া
তরুণ সূর্য আমার জীবন
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,

উড়ে চলে অজানা শূন্যপথে
প্রথম-ক্ষুধায়-অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী,
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চার দিকের ভীরুর ভিড়কে—
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে॥

বাঁশিওয়ালা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানি নে, ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন ক'রে।
দোসরহারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে
চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা—
শুকোবে না তার ফুল।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-পাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নামবে না গানের আসন থেকে;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি

রাগিণীর আবছায়ায় বসে—
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।
ওগো বাঁশিওয়ালা,
সে থাক্‌ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

শান্তিনিকেতন
২ আষাঢ় ১৩৪৩

হঠাৎ-দেখা

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন।

আগে ওকে বারবার দেখেছি
লাল রঙের শাড়িতে—
দালিম-ফুলের মতো রাঙা,
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলন-চাঁপার মতো চিকন-গৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চার দিকে,
যে দূরত্ব সর্ষেক্ষেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে।

হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার।
সমাজবিধির পথ গেল খুলে ;
আলাপ করলেম শুরু—

'কেমন আছ', 'কেমন চলছে সংসার'
ইত্যাদি।
সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে
যেন কাছের-দিনের-ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব,
কোনোটা বা দিলেই না।
বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়—
কেন এ-সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ ক'রে থাকা।

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে ওর সাথিদের সঙ্গে।
এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে।
মনে হল কম সাহস নয়—
বসলুম ওর এক-বেঞ্চিতে।
গাড়ির আওয়াজের আড়ালে
বললে মৃদুস্বরে,
'কিছু মনে কোরো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার!
আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনেই;
দূরে যাবে তুমি,
দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই, যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।
সত্য করে বলবে তো?'
আমি বললেম, 'বলব।'
বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোল,
'আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে—

কিছুই কি নেই বাকি ?'

একটুকু রইলেম চুপ করে ;
তার পর বললেম,
'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।'

খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম নাকি।
ও বললে, 'থাক্, এখন যাও ও দিকে।'
সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে।
আমি চললেম একা।

শান্তিনিকেতন
১০ আষাঢ় ১৩৪৩

আফ্রিকা

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।

বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে ॥

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে ॥

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে,
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা ॥

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল—
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে ;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী ।

শান্তিনিকেতন
২৮ মাঘ ১৩৪৩

স ং যো জ ন

ভারতবিধাতা

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগযুগধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরি-ভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

৭ ১৩১৮

চির-আমি

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায়—
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে গো দিন যেমন আজও দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সেদিন উঠবে ভরি,
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ওই মাঠে।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি ?
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

শান্তিনিকেতন
২৫ চৈত্র ১৩২২

গান

ছিল যে পরানের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক-পারে।
স্বপনবাধা টুটি বাহিরে এল ছুটি,
অবাক আঁখি-দুটি হেরিল তারে।
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুধারে,
তারে যে বেঁধেছিনু সে মায়াহারে।
নীরব বেদনায় পূজিনু যারে, হায়,
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে।

[১৩২৩-২৪]

২

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু, মনে মনে তারে পূজিনু—
সে পূজার মাঝে লুকায়ে আমারেও সে যে সাধিল।

এসেছিল মন হরিতে মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে, আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনারই মাধুরী আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।

[১৩২৩-২৪]

৩

সে যে বাহির হল আমি জানি,
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী।
কোথায় কবে এসেছে সে সাগরতীরে বনের শেষে,
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি॥

হায় রে, আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে,
না জানি তায় আসতে হবে কত ঘুরে!
হিয়া আমার পেতে রেখে সারাটি পথ দিলেম ঢেকে,
আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণখানি॥

? ১৩২৫

৪

তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।
যখন তোমার পেলাম দেখা, অন্ধকারে একা একা
ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন।
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥

দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণা নিত্য বাজে
আপন সুরে আপনি নিমগন।
ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥

দলে দলে আসে লোকে, রচে তোমার স্তব—
নানা ভাষায় নানান কলরব।

ভিক্ষা লাগি তোমার দ্বারে আঘাত করে বারে বারে
কত যে শাপ, কত যে ক্রন্দন।
ইচ্ছা ছিল বিনা পণে আপনাকে দিই পায়ে,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥

? ১৩২৫

৫

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন-সমীরণে।

তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের ব'লে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে॥

? ১৩২৫

৬

আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন্ রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে॥

কে সে আমার কেই বা জানে— কিছু বা তার দেখি আভা,
কিছু বা পাই অনুমানে, কিছু তাহার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কী কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী আমার গানে লুকিয়ে তারে॥

৭ ১৩২৯

৭

ওই মরণের সাগর-পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে।
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারি দিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে—
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥

আজ কী দেখি— কালো চুলের আঁধার ঢালা,
স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মানিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে।
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥

[১৩১০-৩১]

৮

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দিরপ্রাঙ্গণে
ওই তব এল আহ্বান।
চেয়ে দেখো মঙ্গলরাতি জ্বালি দিল উৎসববাতি,
স্তব্ধ এ সংসারপ্রান্তে
ধরো তব বন্দনগান॥

কর্মের-কলরব-ক্লান্ত,
করো তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে, নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ—
হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ॥

৭ মাঘ ১৩৩৪

৯

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥

আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারা রাতি, পাই নি আমার জাগার সাথি—
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে॥

শান্তিনিকেতন
[পৌষ ১৩৩২]

১০

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে,
কে তারে বাঁধল অকারণে।
গতিরাগের সে ছিল গান, আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চমকে দিত বনে।
কে তারে বাঁধল অকারণে॥

মেখলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেত পায়ে
তমাল-ছায়ে-ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়াল-তলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন-হাওয়ার চঞ্চলতার সনে।
কে তারে বাঁধল অকারণে॥

[১৩৩৪]

১১

কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে, বাঁধ টুটেছে মনে,
খেপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চিরব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবানিশার সকল আঁধার-আলা ?
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা সুরের-গন্ধ-ঢালা ?॥

রাতের বাসা হয় নি বাঁধা, দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাই নে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন-মাঝে,
অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা সুরের-গন্ধ-ঢালা ?॥

[১০২৪]

১২

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ॥

সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ॥

স্টুটগার্ট্‌
২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬

১৩

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না তারে মায়ার ছায়া হতে নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা-তারে
সে তো কেবলই গান, কেবলই বাণী।

দিবসরাতি সুরসভার মাঝে যে সুধা করে পান
পরশ তার মেলে না, মেলে না যে, নাহি রে পরিমাণ।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে—
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি।

কলোন
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬

১৪

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে।

ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরানের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে।

৫ মাঘ ১৩৩৪

১৫

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে!
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশি আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গনদ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে।

? ১৩৩৭

১৬

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে ক'রে বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধ'রে—
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে প্রিয় হে প্রিয়।

বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্পসুবাস,
এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো।

শান্তিনিকেতন
১৩ পৌষ ১৩২১

১৭

তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে।
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুন-সমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে।

দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়া ঐ কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে॥

১৮

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি॥

সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি॥
[১৩২৯-৩০]

১৯

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে,
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে॥

তুমি গেলে যখন একলা চ'লে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে॥

১৩ পৌষ ১৩৩০

২০

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,

তাই কেমন হয়ে আছিস সারা ক্ষণ।

হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,

ভাব্‌না যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,

ভাষায় যে তোর সুরের আবরণ।

তোর পরানে কোন্‌ পরশমণির খেলা,

তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।

দিনের স্রোতে তাই তো পলকগুলি

ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,

কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ।

হামবুর্গ

৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬

২১

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে!

তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।

সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার

অজানা বেদনা, সাগরবেলার অধীর বায়ে

বনের ছায়ে।

তারি গুঞ্জন লাগিল গায়ে।

তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয়মাঝে

শরৎ-শিশিরে-ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।

ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে— যেন জনহীন নদীপথটিতে

কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে

বনের ছায়ে।

তাহারি আভাস লাগিল গায়ে।

মালয় জাহাজ

২ অক্টোবর ১৯২৭

২২

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে ; জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরমরমণীয়—
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে ক্ষণেকতরে যদি সজল আঁখি তোলো॥

নিমেষহারা এ শুকতারা এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।
রজনীশেষে এই-যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে—
হে বিরহিণী, আপন হাতে তবে বিদায়দ্বার খোলো॥

[১৩৩৮]

২৩

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।
এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে,
আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে।
এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে॥

সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে
স্বপনফসলের বিছনে বিছনে।
মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,
কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,
ঝরিবে শ্রাবণের বাদলসিচনে॥

শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণবেদনার বরনে আঁকা সে।
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে॥

[মাদ্রাজের পথে
ফাল্গুন ১৩৩৬]

২৪

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো॥

নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কি এ?
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো?॥

[১৩৩৪]

২৫

আমারে ডাক দিল কে ভিতর-পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ওই শিউলিশাখে মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে॥

ঘরছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে খবর যে তার পৌঁছল রে
ঘরছাড়া ওই মেঘের কানে॥

২৬

শিউলি ফোটা ফুরোলো যেই শীতের বনে
এলে যে সেই শূন্য ক্ষণে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণমালা গাঁথি মনে মনে
শূন্য ক্ষণে॥

দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠবে যবে
সুরের মালা বদল হবে তখন তোমার সনে
মনে মনে॥

২৭

যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে
আমায় ডাকলে কেন এমন করে?
যেতে হবে যে পথ বেয়ে শুকনো পাতা আছে ছেয়ে,
হাতে আমার শূন্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেব ভ'রে?॥

গানহারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশি কী যে বলে!
নেই আয়োজন, নেই মম ধন, নেই আভরণ, নেই আবরণ—
রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধবে তোমায় বাহুডোরে॥

২৮

ওহে সুন্দর, মরি মরি,
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি!
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরানের পাশে,

দেয় সুধারসধারে-ধারে
মম অঞ্জলি ভরি ভরি ॥

মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলকপূজাঞ্জলি,
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি।
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরিদীপশিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি ॥

[১৩২৪]

২৯

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়,
ঝুমকো লতার চিকন পাতা কাঁপে রে কার চমকে-চাওয়ায়।
হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্মরণখানি
আমের বোলের গন্ধে মিশে কাননকে আজ কান্না পাওয়ায় ॥

কাঁকন দুটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে!
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়াল-বনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ওই আভাস দোলে নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে,
তার সাথে মোর দেখা ছিল সেই সে কালের তরী-বাওয়ায় ॥

শিলাইদহ
১২ চৈত্র ১৩২৮

৩০

পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা
যায় যায় যায় চলে।

আলোছায়ার সুরে   অনেক কালের সে কোন্ দূরে
ডাকে   আ য়   আ য়   আয় ব'লে ॥

যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুন-রাতি
সেথায় তারা ফিরে ফিরে খোঁজে আপন সাথি।
আলোছায়ায় যেথা   অনেক দিনের সে কোন্ ব্যথা
কাঁদে   হা য়   হা য়   হায় ব'লে ॥

৩১

দে পড়ে দে আমায় তোরা   কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার   দূরের বাণীর পরশমানিক   লাগুক আমার প্রাণে এসে।
শস্যক্ষেতের গন্ধখানি   একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া   লাগুক আমার মুক্তকেশে ॥

নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরণ   মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য ডোবার রাঙা বেলায়   ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে   অশ্রু আভাস উঠবে ভেসে ॥

? ১৩৩২

৩২

কেন রে এতই যাবার ত্বরা?
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর   গানের ভরা?
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবই?
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী?
নিল কি বিদায় শিথিল করবী   বৃন্তঝরা?।

এখনি তোমার পীত উত্তরী   দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের   আসন মেলে?

যেন কার উত্তরীয়ের
পরশের হরষ লেগে !
আজি কার মিলন-গীতি ধ্বনিছে কানন-বীথি,
মুখে চায় কোন্ অতিথি
আকাশের নবীন মেঘে ॥

ঘিরেছিস মাথায় বসন
কদমের কুসুম-ডোরে,
সেজেছিস নয়ন-পাতে
নীলিমার কাজল প'রে ।
তোমার ওই বক্ষতলে নবশ্যাম দূর্বাদলে
আলোকের ঝলক ঝলে
পরানের পুলক-বেগে ॥

[বর্ষামঙ্গল
১৩৩২]

৩৮

জানি, হল যাবার আয়োজন—
তবু, পথিক, থামো কিছুক্ষণ ।
শ্রাবণ-গগন বারি-ঝরা, কানন-বীথি ছায়ায় ভরা,
শুনি জলের ঝরোঝরে
যূথীবনের ফুল-ঝরা ক্রন্দন ॥

যেয়ো—
যখন বাদল-শেষের পাখি
পথে পথে উঠবে ডাকি ।
শিউলিবনের মধুর স্তবে জাগবে শরৎলক্ষ্মী যবে,
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে
পরবে ভালে মঙ্গলচন্দন ॥

[বর্ষামঙ্গল
১৩৩২]

৩৯

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর
হে গম্ভীর !
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর,
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর,
হে গম্ভীর !
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসবমন্দির,
হে গম্ভীর !

দহনশয়নে তপ্ত ধরণী পড়ে ছিল পিপাসার্তা।
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর,
হে গম্ভীর !!

[বর্ষামঙ্গল
১৩৩৬]

৪০

পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে উঠে।
চেনাশোনার কোন্ বাইরে
যেখানে পথ নাই নাই রে
সেখানে অ-কারণে যায় ছুটে।
ঘরের মুখে আর কি রে
কোনো দিন সে যাবে ফিরে?
যাবে না, যাবে না—
তার দেয়াল যত সব গেল টুটে।

বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা
কোন্ বলরামের আমি চেলা,
আমার স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে।
যা না চাইবার তাই আজি চাই গো।
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো!
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।

[শান্তিনিকেতন
বর্ষামঙ্গল ১৩৪৩]

লেখন

স্বপ্ন আমার জোনাকি
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা।

২

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে
স্বপ্নপাখির বাসা,
কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের
খ'সে-পড়া ভাঙা ভাষা।

৩

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ,
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক আলোর ফিরিবার আশে
বসে আছে উৎসুক।

৪

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায়-হায়॥

৫

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা
বচনহারা—
আঁধারে যে তাহা জ্বলে রজনীর
দীপ্ত তারা।

৬

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায়
নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যথা
একা একা বাস করে॥

৭

অতল আঁধার নিশাপারাবার,
তাহারই উপরিতলে
দিন সে রঙিন বুদ্‌বুদসম
অসীমে ভাসিয়া চলে॥

৮

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে
সমুদ্র করে দান
অতল প্রেমের অশ্রুজলের গান॥

৯

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল,
সেই তারি আনন্দ॥

১০

সুন্দরী ছায়ার পানে
তরু চেয়ে থাকে—
সে তার আপন, তবু
পায় না তাহাকে॥

১১

আমার প্রেম রবি-কিরণ-হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে
তোমারে ঘেরে যেন॥

১২

মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে
আনন্দ পায় ছাড়া—
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায়
ছুটে এসে দেয় নাড়া॥

১৩

আলো যবে ভালোবেসে
মালা দেয় আঁধারের গলে
সৃষ্টি তারে বলে॥

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ॥

My thoughts, like sparks,
ride on winged surprises
carrying a single laughter.

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে॥

The tree gazes in love at the beautiful shadow
who is his own and yet whom he never can grasp.

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন॥

Let my love, like sunlight, surround you
and give you a freedom illumined.

মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া,
পলকে পলকে পাতায় পাতায় দুলে ওঠে দেয় নাড়া॥

Joy freed from the bond of earth's slumber
rushes into the leaves numberless
and dances in the air for a day.

১৪

দিন হয়ে গেল গত।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয়দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে-আসা
পথিক দুরাশা যত।

১৫

চাহিয়া প্রভাতরবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
'রাখিব তোমায় চিরকাল মনে'
বলিয়া পড়িল টুটে।

১৬

আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।

১৭

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে।

১৮

পর্বতমালা আকাশের পানে
চাহিয়া না কহে কথা—
অগমের লাগি ওরা ধরণীর
স্তম্ভিত ব্যাকুলতা।

১৯

ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার
'দাও' বলি দাঁড়ালে দেবতা,
মানুষ সহসা পায়
আপনার ঐশ্বর্যবারতা।

২০

অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার
অমরার ছবি আঁকে।

২১

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারি দিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।

২২

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দু ধারে আছে মোর দেবালয়।

২৩

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্যেরে জপে
লয়ে তারকার জপমালা।

২৪

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা
ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে
ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল।

২৫

দিন দেয় তার সোনার বীণা
নীরব তারার করে—
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে।

২৬

সূর্য-পানে চেয়ে ভাবে
মল্লিকামুকুল,
'কখন ফুটিবে মোর
অত বড়ো ফুল!'

২৭

চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায়
স্তিমিত প্রদীপখানি
নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায়
কী বাজায় কিবা জানি।

২৮

উতল সাগরের
অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের
মাগিছে চুম্বন।

২৯

সমস্ত-আকাশ-ভরা
আলোর মহিমা
তৃণের শিশির-মাঝে
খোঁজে নিজ সীমা।

৩০

কল্লোলমুখর দিন
ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে
সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল
পেতে চায় ফল।
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে
চলিছে চঞ্চল।

৩১

মুক্ত যে ভাবনা মোর
ওড়ে ঊর্ধ্ব-পানে
সেই এসে বসে মোর গানে।

প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায়, মুছে ফেলে তায়-
আবার ফুটায়ে তুলে।

৩৩

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

৩৪

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

৩৫

কোন্ খসে-পড়া তারা
মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজ
সুরের অশ্রুধারা।

৩৬

বসন্ত পাঠায় দূত
রহিয়া রহিয়া
যে কাল গিয়েছে তার
নিশ্বাস বহিয়া।

৩৭

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন॥

নদীর ঘাটের কাছে

নদীর ঘাটের কাছে নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।

আজ গিয়ে সেইখানে দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে নৌকো কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।

জানি না কোন্ দেশে পৌঁছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে!

থাকি ঘরের কোণে, সাধ জাগে মোর মনে-
অমনি করে যাই ভেসে, ভাই,
নতুন নগর বনে।

দূর সাগরের পারে জলের ধারে ধারে
নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।

পাহাড়চূড়া সাজে নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না যে।

কোন্ সে বনের তলে নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে নৌকো যে যায় ভেসে-
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?।

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
'চেয়ে দেখো' 'চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে, দুদ্দাড় জানালা দরোজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন্ রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেণ্টের দোল, যেন খেপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্কুল ছোটে হন্‌হন্,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছট্‌ফট্,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।
ঘণ্টা কেবলই দোলে, ঢঙ্ ঢঙ্ বাজে—
যত কেন বেলা হোক তবু থামে না যে।
লক্ষ লক্ষ লোক বলে, 'থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে, একি পাগলামো!'
কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে,
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।
আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক-নাকো সোজা বোম্বাই।

দিল্লি লাহোরে যাক, যাক-না আগ্‌রা—
মাথায় পাগড়ি দেবো, পায়েতে নাগ্‌রা।
কিম্বা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট-হ্যাট-কোটে।
কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই,
দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।

[পৌষ ১৩৩০]

রঙ্গ

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোনপাপ্‌ড়ি,
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপ্‌ড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি,
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের শুক্ত,
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো
চার কঠিন দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা,
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না,
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না॥

১০৪।

দামোদর শেঠ

অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি?
মুড়কির মোওয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি।
আনবে কটকি জুতো, মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো।
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি?।

চিনেবাজারের থেকে এনো তো করমচা,
কাঁকড়ার ডিম চাই, চাই যে গরম চা।
নাহয় খরচা হবে, মাথা হবে হেঁট কি?।

মনে রেখো, বড়ো মাপে করা চাই আয়োজন।
কলেবর খাটো নয়, তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝরিয়াতে জিলিপির রেট কী॥

গোরা বোষ্টম বাবা

টেরিটিবাজারে তার সন্ধান পেনু—
গোরা বোষ্টম বাবা, নাম নিল বেণু।
শুদ্ধনিয়ম-মতে মুরগিরে পালিয়া
গঙ্গাজলের যোগে রাঁধে তার কালিয়া
মুখে জল আসে তার চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায় বেচে পদরেণু॥

বর এসেছে বীরের ছাঁদে

বর এসেছে বীরের ছাঁদে, বিয়ের লগ্ন আটটা—
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে, গালেতে গালপাট্টা।
শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ যখন উঠল জমে
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে, বর হেসে কয়— 'ঠাট্টা'॥

রাজব্যবস্থা

মহারাজা ভয়ে থাকে পুলিসের থানাতে,
আইন বানায় যত পারে না তা মানাতে।
চর ফিরে তাকে তাকে,
সাধু যদি ছাড়া থাকে,
খোঁজ পেলে নৃপতিরে হয় তাহা জানাতে—
রক্ষা করিতে তারে রাখে জেলখানাতে॥

যোগিন্দা

যোগিন্দাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে।
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে
বেড়িয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে।
'জুলুম তোদের সইব না আর' হাঁক চালাতেন রোজই,
পরের দিনেই আবার চলত ওই ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী—
ডেকে বলতেন, 'কোথায় টুনু, কোথায় গেল খোকি?'

'ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া'
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চার দিকে তাঁর ছোটো বড়ো জুটত যত লোভী
কেউ বা পেত মার্বেল, কেউ গণেশ-মার্কা ছবি,
কেউ বা লজঞ্জুস—
সেটা ছিল মজলিশে তাঁর হাজরি দেবার ঘুষ।
কাজলি যদি অকারণে করত অভিমান
হেসে বলতেন 'হাঁ করো তো', দিতেন ছাঁচিপান।
আপন-সৃষ্ট নাৎনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি—
পাগলি ছিল, পটলি ছিল, আর ছিল জঙ্গুলি।
কেয়াখয়ের এনে দিত, দিত কাসুন্দিও—
মায়ের হাতের জারক লেবু যোগিন্‌দাদার প্রিয়।

তখনো তাঁর শক্ত ছিল মুগুর-ভাঁজা দেহ—
বয়স যে ষাট পেরিয়ে গেছে, বুঝত না তা কেহ।
ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি, চোখদুটি জলজলে;
মুখ যেন তাঁর পাকা আমটি, হয় নি সে থল্‌থলে।
চওড়া কপাল, সামনে মাথায় বিরল চুলের টাক,
গোঁফজোড়াটার খ্যাতি ছিল— তাই নিয়ে তাঁর জাঁক।

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি;
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী।
চেয়ে রইতেম মুখের দিকে শান্ত শিষ্ট হয়ে;
কাঁসর ঘণ্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেকট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।
ঘরের কোণে কোণে ছায়া; আঁধার বাড়ত ক্রমে—
মিট্‌মিটে এক তেলের আলোয় গল্প উঠত জমে।

শুরু হলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক ;
সত্যি মিথ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক
ভূগোল হত উল্টোপাল্টা, কাহিনী আজগুবি—
মজা লাগত খুবই।
গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
বলার ভাবে যে রঙটুকু মন আমাদের ছাইত॥—

হুশিয়ারপুর পেরিয়ে গেল ছন্দৌসির গাড়ি,
দেড়টা রাতে সর্‌হরোয়ায় দিল স্টেশন ছাড়ি।
ভোর থাকতেই হয়ে গেল পার
বুলন্দশর, আম্রোরিসর্সার।
পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এল
যোগিন্‌দাদার বিষম খিদে পেল।
ঠোঙায়-ভরা পকৌড়ি আর চলছে মটর-ভাজা,
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা।
পাঁচশো-সাতশো লোক-লস্কর, বিশ-পঁচিশটা হাতি—
মাথার উপর ঝালর-দেওয়া প্রকাণ্ড এক ছাতি।
মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিল তাজ ;
বললে, 'যুবরাজ,
আর কতদিন রইবে, প্রভু, মোতিমহল ত্যেজে!'
বলতে বলতে রামশিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে॥

ব্যাপারখানা এই—
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।
সদ্য ক'রে বিয়ে,
নাথ্‌দোয়ারার সেগুন-বনে শিকার করতে গিয়ে
তার পরে যে কোথায় গেল খুঁজে না পায় লোক—
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রানীমায়ের চোখ।

খোঁজ পড়ে যায় যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায় ;
খোঁজে পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে, খোঁজে লালামুসায়।
খুঁজে খুঁজে লুধিয়ানায় ঘুরেছে পঞ্জাবে ;
গুলজারপুর হয় নি দেখা, শুনছি পরে যাবে।
চঙ্গামঙ্গা দেখে এল সবাই আলমগিরে ;
রাওলপিণ্ডি থেকে এল হতাশ হয়ে ফিরে॥

ইতিমধ্যে যোগিন্‌দাদা হাৎরাশ জংশনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি-দংশনে।
দিব্যি চলছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর ;
জোড়হাতে কয়, 'রাজাসাহেব, কঁহা আপ্‌কা ঘর্?'
দাদা ভাবলেন, সম্মানটা নিতান্ত জমকালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তাঁর দেখে চরের ঘনালো সন্দেহ—
এ মানুষটি রাজপুত্রই, নয় কভু আর-কেহ।
রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়,
ওরে বাস্ রে, দেখে নি সে আর-কোনো জায়গায়॥

তার পরে মাস-পাঁচেক গেছে দুঃখে সুখে কেটে ;
হারাধনের খবর গেল জৌনপুরের স্টেটে।
ইস্টেশনে নির্ভাবনায় বসে আছেন দাদা—
কেমন করে কী যে হল, লাগল বিষম ধাঁধা।
গুর্খা ফউজ সেলাম ক'রে দাঁড়ালো চার দিকে,
ইস্টেশনটা ভরে গেল আফগানে আর শিখে।
ঘিরে তাঁকে নিয়ে গেল কোথায় ইটাসিতে,
দেয় কারা সব জয়ধ্বনি উর্দুতে ফার্সিতে।

সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছমন্‌ঝোলায়
বাজিয়ে সানাই চড়িয়ে দিল ময়ুরপংখি দোলায়।
দশটা কাহার কাঁধে নিল, আর পঁচিশটা কাহার
সঙ্গে চলল তাঁহার।
ভাটিণ্ডাতে দাঁড় করিয়ে জোয়ালো ছুর্‌বিনে
দখিন মুখে ভালো করে দেখে নিলেন চিনে
বিন্ধ্যাচলের পর্বত।
সেইখানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের শর্বত।
সেখান থেকে এক পহরে গেলেন জৌনপুরে
পড়ন্ত রোদ্‌দুরে॥

এইখানেতেই শেষে
যোগিন্‌দাদা থেমে গেলেন যৌবরাজ্যে এসে।
হেসে বললেন, 'কী আর বলব দাদা,
মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।'
'ও হবে না' 'ও হবে না' বিষম কলরবে
ছেলেরা সব চেঁচিয়ে উঠল— 'শেষ করতেই হবে।'

যোগিন্‌দা কয়, 'যাক্‌গে,
বেঁচে আছি শেষ হয় নি ভাগ্যে।
তিনটে দিন না যেতে যেতেই হলেম গলদ্‌ঘর্ম।
রাজপুত্র হওয়া কি, ভাই, যে-সে লোকের কর্ম?
মোটা মোটা পরোটা আর তিন-পোয়াটাক ঘি
বাংলাদেশের-হাওয়ায়-মানুষ সইতে পারে কি?
নাগরা জুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা—
এগুলি কি সহজ করা সোজা?
তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ
হিন্দি ব'লেই করলে না সন্দেহ।

যেদিন দূরে শহরেতে চলছিল রামলীলা
পাহারাটা ছিল সেদিন ঢিলা।
সেই সুযোগে গৌড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গৌড়ে,
চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা—
মাঝের থেকে চর পেয়ে যায় দশটি হাজার টাকা।
কিন্তু গুজব শুনতে পেলেম, শেষে
কানে মোচড় খেয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে সে।'

'কেন তুমি ফিরে এলে' চেঁচাই চারি পাশে,
যোগিনদাদা একটু কেবল হাসে।
তার পরে তো শুতে গেলেম ; আধেক রাত্রি ধ'রে
শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে।
ভারতভূমির সব ঠিকানাই ভুলি যদি দৈবে
যোগিনদাদার ভূগোল-গোলা গল্প মনে রইবে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

বাসাবাড়ি

এই শহরে এই তো প্রথম আসা।
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি।
অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।
ধাঁধা ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে
দেখি পথের বাঁ দিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে।
আঁধার-মুখোস-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া—
হাঁ-করা-মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া।
চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।

বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি— কেই বা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস,
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউ বা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে!
শুধাই আমি, 'আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই?'
মনে হল জবাব এল, 'আমরা না ই নাই।'
সকল দুয়োর জানলা হতে যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।
একসঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, 'আমরা না ই নাই।'
আমি শুধাই, 'কিসের কাজে এসেছ এইখানে?'
জবাব এল, 'সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদের দল,
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপরেতে চাপা দিয়ে যাই—
না ই না ই নাই।'

পরের দিনে সেই বাড়িতে গেলেম সকালবেলা
ছেলেরা সব পথে করছে লড়াই-লড়াই খেলা,
কাঠি হাতে দুই পক্ষের চলছে ঠকাঠকি।
কোণের ঘরে দুই বুড়োতে বিষম বকাবকি—
বাজি-খেলায় দিনে দিনে কেবল জেতা-হারা,
দেনা পাওনা জমতে থাকে, হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রান্নাঘরের, শব্দ বাসন-মাজার;
শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।

একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলার 'আমরা না ই নাই।'

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ঘরের খেয়া

সন্ধ্যা হয়ে আসে,
সোনা-মিশোল ধূসর আলো ঘিরল চারি পাশে।
নৌকোখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে;
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে।
আপন গাঁয়ে কুটির আমার দূরের পটে লেখা,
ঝাপ্‌সা আভায় যাচ্ছে দেখা বেগ্‌নি রঙের রেখা।
যাব কোথায় কিনারা তার নাই,
পশ্চিমেতে মেঘের গায়ে একটু আভাস পাই।

হাঁসের দলে উড়ে চলে হিমালয়ের পানে;
পাখা তাদের চিহ্নবিহীন পথের খবর জানে।
শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, শেষ হল জল-ঢালা;
আকাশতলে শুরু হল শুভ্র আলোয় পালা।
ক্ষেতের পরে ক্ষেত একাকার, প্লাবনে রয় ডুবে;
লাগল জলের দোলযাত্রা পশ্চিমে আর পুবে।
আসন্ন এই আঁধার-মুখে নৌকোখানি বেয়ে
যায় কারা ওই; শুধাই, 'ওগো নেয়ে,
চলেছ কোন্‌খানে?'
যেতে যেতে জবাব দিল, 'যাব গাঁয়ের পানে।'

অচিন-শূন্যে-ওড়া পাখি চেনে আপন নীড়,
জানে বিজন-মধ্যে কোথায় আপন-জনের ভিড়।

অসীম আকাশ মিলেছে ওর বাসার সীমানাতে—
ওই অজানা জড়িয়ে আছে জানাশোনার সাথে।
তেমনি ওরা ঘরের পথিক, ঘরের দিকে চলে
যেথায় ওদের তুল্‌সিতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।
দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে,
মিলায় সুদূর নীরে।
সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে
আমার চলার ঠিকানা নাই, ওরা চলল গাঁয়ে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

আকাশপ্রদীপ

অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে
আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিল আকাশ-পানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে, এই কথা সে জানে—
ওই প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।
পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ,
অজানা দেশ কত আছে, অচেনা পর্বত—
তারি মধ্যে স্বর্গ থেকে ছোট্ট ঘরের কোণ
যায় কি দেখা যেথায় থাকে দুটিতে ভাই বোন?
মা কি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে,
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে?
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে—
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির 'পরে।

পতিসর
৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র জীর্ণ পুষ্প সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে উড়ে যাব রজনীপ্রভাতে
অস্তসিন্ধু পরপারে। কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে, কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর,
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি'; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধূলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম; সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ বৈশাখ
১৩৪১

যাবার সময় হল বিহঙ্গের

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে; স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধুলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র জীর্ণপুষ্প -সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে যাব উড়ে রজনীপ্রভাতে
অস্তসিন্ধু-পরপারে। কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে; কভু আম্রমুকুলের-গন্ধে-ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর,
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর,
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধুলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম; সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩৪১

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জমেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি-পানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়। শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে,

শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা ॥

আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে ।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া । উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই । চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে ।
আপনারে দেখি আমি আপন-বাহিরে , যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন , অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো । এই তো ছুটির কাল—
সর্ব দেহ মন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে । মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে ; রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল , কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড় ॥

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ -সম ॥

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

পশ্চাতের নিত্য সহচর

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ ; পিছুডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন্ গুন্ গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরস্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত কামনার রঙিন ব্যর্থতা—
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী॥

শান্তিনিকেতন
৪ অক্টোবর ১৯৩৭

অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ ; পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে

সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে, মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদির তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে—
হে পূষন্‌, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক॥

শান্তিনিকেতন
৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭

কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে

কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন
পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো, কবি,—
পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলুব্ধ জনতাদেবীরে
বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া। দিনের সহস্র কণ্ঠ
ক্ষীণ হয়ে এল; যে প্রহরগুলি ধ্বনিপণ্যবাহী,
নোঙর ফেলেছে তারা সন্ধ্যার নির্জন ঘাটে এসে।
আকাশের আঙিনায় শান্ত যেথা পাখির কাকলি,
সুরসভা হতে সেথা নৃত্যপরা অপ্সরকন্যার
বাষ্পে-বোনা চেলাঞ্চল উড়ে পড়ে, দেয় ছড়াইয়া
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণরশ্মিচ্ছটা। চরম ঐশ্বর্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু—

দিল মোরে করস্পর্শ ; প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে ; গভীর অদৃশ্য লোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের শৈউলি -সম যারা
নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত হাওয়ায় হাওয়ায়,
রূপ নিয়ে দেখা দেবে ভাঁটার নদীর প্রান্ততীরে
অনাদৃত মঞ্জরির অজানিত আগাছার মতো—
কেহ শুধাবে না নাম ; অধিকারগর্ব নিয়ে তার
ঈর্ষা রহিবে না কারো ; অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা
খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।

শান্তিনিকেতন
১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭

পরমমূল্য

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক ! রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্য-নক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে ; দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে—
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

শান্তিনিকেতন
১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭

ঘরছাড়া

তখন একটা রাত, উঠেছে সে তড়বড়ি
কাঁচা ঘুম ভেঙে। শিয়রেতে ঘড়ি
কর্কশ সংকেত দিল নির্মম ধ্বনিতে ॥

অঘ্রানের শীতে
এ বাসার মেয়াদের শেষে
যেতে হবে আত্মীয়পরশহীন দেশে
ক্ষমাহীন কর্তব্যের ডাকে।
পিছে পড়ে থাকে
এবারের মতো
ত্যাগযোগ্য গৃহসজ্জা যত :
জরাগ্রস্ত তক্তপোশ কালিমাখা-শতরঞ্চ-পাতা ;
আরাম-কেদারা ভাঙা-হাতা ;
পাশের শোবার ঘরে
হেলে-পড়া টিপয়ের 'পরে
পুরোনো আয়না দাগ-ধরা ;
পোকাকাটা হিসাবের খাতা -ভরা
কাঠের সিন্দুক এক ধারে।
দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া সারে সারে
বহু বৎসরের পাঁজি,
কুলুঙ্গিতে অনাদৃত পূজার ফুলের জীর্ণ সাজি ॥

প্রদীপের স্তিমিত শিখায়
দেখা যায়
ছায়াতে জড়িত তারা
স্তম্ভিত রয়েছে অর্থহারা ॥

ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকারগর্জনরবে। নিদ্রায়-গভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে তিন॥

শূন্য-পানে চক্ষু মেলি
দীর্ঘশ্বাস ফেলি
দূরযাত্রী নাম নিল দেবতার,
তালা দিয়ে রুধিল দুয়ার।
টেনে নিয়ে অনিচ্ছুক দেহটিরে
দাঁড়ালো বাহিরে॥

ঊর্ধ্বে কালো আকাশের ফাঁকা
ঝাঁট দিয়ে চলে গেল বাদুড়ের পাখা।
যেন সে নির্মম
অনিশ্চিত-পানে-ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়াসম।
বৃদ্ধবট মন্দিরের ধারে,
অজগর অন্ধকার গিলিয়াছে তারে।
সদ্য-মাটি-কাটা পুকুরের
পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের
খেজুরের-পাতা-ছাওয়া, ক্ষীণ আলো করে মিট্‌ মিট্‌।
পাশে ভেঙে-পড়া পাঁজা, তলায় ছড়ানো তার ইট।
রজনীর মসীলিপ্ত-মাঝে
লুপ্তরেখা সংসারের ছবি— ধান-কাটা কাজে
সারাবেলা চাষির ব্যস্ততা;
গলা-ধরাধরি কথা
মেয়েদের; ছুটি-পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে-যাওয়া

হৈ হৈ রবে ; হাটবারে ভোরবেলা
বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা ;
আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ও পারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে-চলা ॥

নিত্য-জানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে
যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে ।

যেতে যেতে পথপাশে
পানা-পুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহু দিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন ।
আঁকাবাঁকা গলি
রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি ;
দুই পাশে বাসা সারি সারি ;
নরনারী
যে যাহার ঘরে
রহিল আরামশয্যা-'পরে ।
নিবিড়-আঁধার-ঢালা আমবাগানের ফাঁকে
অসীমের টিকা দিয়া বরণ করিয়া স্তব্ধতাকে
শুকতারা দিল দেখা ।
পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে ।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে
দূর হতে দূরে ॥

শ্রীনিকেতন
২২ নভেম্বর ১৯৩৬

পরিচয়

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি,
'পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোন্‌খানে?'
আমি শুধু বলেছি, 'কে জানে!'

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান—
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক—
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক।'
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তার পরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা;
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে,
ফাল্গুনের উৎসবরাতির
নিমন্ত্রণলিখনপাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থহারা।

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
শুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
'সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে?'

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার,
'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।'

শান্তিনিকেতন
১৩ মাঘ ১৩৪৩

স্মরণ

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।
হেথায় যে মঞ্জরি দোলে শাখে শাখে,
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়,
ওরা মোর নাম ধরে কভু নাহি ডাকে,
মনে নাহি করে বসি নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই,
মিলায় নিমেষে কত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।

ওদের এনেছে ডেকে আদিসমীরণে
ইতিহাসলিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে,
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।
সেদিন ভুলিয়া ছিনু কীর্তি ও খ্যাতি,
বিনা পথে চলেছিল ভোলা মন;
চারি দিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।
সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন,
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার;
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রঙ ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করি নাই—
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।

সেদিনের হারা আমি, চিহ্নবিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান—
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিনু আহ্বানপাঁতি
যেখানে কালের সীমা-রেখা নেই,
খেলা ক'রে চলে যায় খেলিবার সাথি—
গিয়েছিনু দায়হীন সেখানেই।
দিই নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল—

চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই—
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার—
সে আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়?
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

শান্তিনিকেতন
২৫ চৈত্র ১৩৪৩

জন্মদিন

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে, কী জানি,
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই-যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন ; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে ;
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা-সম—
একমন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা ॥

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য ; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি,
উদয়শিখরে তার দেখো আদি জ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো— অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে ॥

হে বসুধা,
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে— যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা
তোমার সংসাররথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল ক'মে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য-পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ ;
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু, জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে

দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদিতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে— তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব॥

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতি-শেষে অবশিষ্ট রবে, তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লান স্পর্শ লেগে,
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যুপরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরির রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশিরকণিকায়; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলিসূত্রে; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্ব দেহে রোমাঞ্চিত বাণী—
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে—
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার; কী ইঙ্গিতে, কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চ'লে যেত অসীমের আত্মীয়তা

অথবা অদেখা দূত ; ব'লে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে॥

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গণি
যা-কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয় ; তাহে সে পাবে না লাজ—
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো, অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারম্বার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হত জড়যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হ'ত নিশ্বসিত, আজি মর্তের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে,
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টি-হারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি॥

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর-হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব— এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষি দৃষ্টির সম্মুখে। দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌনবীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।—

আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এ পারের ভালোবাসা— বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

কালিম্পঙ
২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

বধূ

ঠাকুরমা দ্রুত তালে ছড়া যেত প'ড়ে
ভাবখানা মনে আছে— বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।

বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনীগানে
ছন্দের লাগালো দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়—
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।

ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে গলি বাহিয়া
চিহ্নিত করেছে মোর হিয়া
গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় এঁকেবেঁকে।
তারি প্রান্ত থেকে
অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে।
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে;
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা, আসে না তবুও—
পথ শেষ হবে না কভুও।

সেকাল মিলালো। তার পরে, বধূ-আগমনগাথা
গেয়েছে মর্মরচ্ছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা,
বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে,
মধ্যাহ্নে করুণ রাগিণীতে
বিদেশী পান্থের শ্রান্ত সুরে।

অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে
তন্দ্রার প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি
মৃদু রণরণি।
ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে;
পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
দিয়েছিল দেখা
অনাগত চরণের অলক্তের রেখা।
কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধ'রে,
সচকিতে,
দেখে তবু পাই নি দেখিতে॥

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগালো হরষ,
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
'তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে!'
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ;
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, 'আমি তারি দূত;
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে,
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা;
ফিরিছে সে চিরপথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে—
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'

২৫ অক্টোবর ১৯৩৮

শ্যামা

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে;
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি। ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার,
সকালবেলার রোদে বাদাম গাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে,
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে—
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল। ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্মস্পর্শময়ী।
সাহস হল না কথা কই।
হৃদয় বাথিল মোর অতিমৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে!
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত-দল। আমি মুখচোরা ছেলে
এক পাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা।
পরিবেশনের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো বা গ'ড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।
কখনো বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ—
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—

রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ।
পুরুষসুলভ মোর কত মূঢ়তারে
ধিক্কার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে।
একদিন বলেছিল 'জানি হাত দেখা';
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গণেছিল রেখা,
বলেছিল 'তোমার স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন'।— দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার॥

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না-পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে-বিষাদে-মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো;
আশ্বিনের আলো
বাজালো সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

৩১ অক্টোবর ১৯৩৮

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে
বামুন-মারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আশমানি এক চেলা
ঠিকদুক্কুর বেলা
বেগ্‌নি-সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে

বসে বসে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে,
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাত-দলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত,
এই কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুকরো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁওয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে;
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে॥

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলেদুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়॥

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টনটনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে,
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম;
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির বদলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ওই-যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি—
ক'দিন হল জানি নে কোন্ গোঁয়ার খুনি
সমথ তার নাৎনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে॥

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলেদুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়॥

শান্তিনিকেতন। ২৮ মার্চ ১৯৩৯

ইস্‌টেশন

সকাল বিকাল ইস্‌টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে, কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউ বা গাড়ি ফেল করে তার শেষ মিনিটের দোষে।—
দিনরাত গড়্‌-গড়্‌ ঘড়্‌-ঘড়্‌
গাড়ি-ভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে কভু পুবে।

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্য-মেলার নিত্য-ভোলার ভাষা—
কেবল যাওয়া-আসা।
মঞ্চতলে দণ্ডে পলে ভিড় জমা হয় কত—
পতাকাটা দেয় দুলিয়ে, কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখ দুঃখ ক্ষতি লাভের তাড়া
দেয় সবলে নাড়া।—
সময়ের ঘড়ি-ধরা অঙ্কেতে
ভোঁ ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজে সংকেতে।
দেরি নাহি সয় কারো কিছুতেই—
কেহ যায়, কেহ থাকে পিছুতেই।

ওদের চলা ওদের প'ড়ে থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে কেবল ছবি আঁকায়।
খানিকক্ষণ যা চোখে পড়ে তার পরে যায় মুছে,
আত্ম-অবহেলার খেলা নিত্যই যায় ঘুচে।

ছেঁড়া পটের টুকরো জমে পথের প্রান্ত জুড়ে,
তপ্ত দিনের ক্লান্ত হাওয়ায় কোন্‌খানে যায় উড়ে।
'গেল গেল' ব'লে যারা ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক-পরে কান্না-সমেত তারাই পিছে ছোটে।—
ঢং ঢং বেজে ওঠে ঘণ্টা,
এসে পড়ে বিদায়ের ক্ষণটা।
মুখ রাখে জানলায় বাড়িয়ে,
নিমিষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে॥

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল, হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার ইস্‌টেশনে একা।—
এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।
আসে কারা এক দিক হতে ওই,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ওই॥

শান্তিনিকেতন
৭ জুলাই ১৯৩৮

প্রজাপতি

সকালে উঠেই দেখি,
প্রজাপতি একি
আমার লেখার ঘরে
শেলফের 'পরে

মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা—
রেশমি সবুজ রঙ, তার 'পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারা রাত
কী ভেবেছে কে জানে তা—
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণ গন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা ওর কাছে সমস্ত বৃথাই।

বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে;
তার বেশি সত্য যাহা তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানে না ও কভু।
পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ,

প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে ;
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা। সুন্দর যা অনির্বচনীয়,
যাহা প্রিয়—
সেই বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে ॥

আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারি ধারে।
কী আছে বা নাই কী এ
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর ॥

শান্তিনিকেতন
১০ মার্চ ১৯৩৯

রাতের গাড়ি

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

অসীম আঁধারে
কালি-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়হারা দেশে।
ক্ষণ-আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতিদূর তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি—
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ॥

চালায় যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি যেন বহে নিশ্বাস—
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে॥

শান্তিনিকেতন
২৮ মার্চ ১৯৪০

যক্ষ

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্পব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত-আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরিশীর্ষে, বন হতে বনে।
সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দচঞ্চলতা,
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহবারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে।
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর।

পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।
এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা—
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির-আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ড পল গণি গণি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা
কবি তারে দেয় নাই বিরহের-তীর্থ-গামী ভাষা।
তার তরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা।

নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্তভূমে—
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।
প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ;
স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায়-বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্তের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

কালিম্পং
২০ জুন ১৯৩৮

উদ্‌বৃত্ত

তব দক্ষিণ হাতের পরশ কর নি সমর্পণ
লেখে আর মোছে তব আলোছায়া ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি,
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে জাগালো পিয়াসি মন।

যতটুকু পাই ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

গান

ঐ দক্ষিণ হাতের পরশ
কর কি সমর্পণ।
লিখে যায় রেখা আলো ছায়ায় ঐ
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিম্পন ॥

হিমালয় কন্যা নদী
পূর্ণ প্রাণের প্রসাদ না দিল যদি,
শুধু কুণ্ঠিতরশ্মির ধারা
তীরের প্রান্তে
কাঁদালো পিয়াসী মন ॥

দূরে যাই তীর্থ জলধার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
নব দিবসের তীরের পথে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন ॥

১।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সানাই

সারা রাত ধ'রে
গোছা গোছা কলাপাতা আসে গাড়ি ভরে
আসে সরা খুরি
ভূরি ভূরি।
এ পাড়া ও পাড়া হতে যত
রবাহূত অনাহূত আসে শত শত ;
প্রবেশ পাবার তরে
ভোজনের ঘরে
উর্ধ্বশ্বাসে ঠেলাঠেলি করে ;
বসে পড়ে যে পাবে যেখানে,
নিষেধ না মানে,
কে কাহারে হাঁক ছাড়ে হৈ হৈ—
এ কই, ও কই !
রঙিন-উষ্ণীষ-ধর
লালরঙা সাজে যত অনুচর
অনর্থক ব্যস্ততায় ফেরে সবে
আপনার দায়িত্ব-গৌরবে।
গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায় ;
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।
ও দিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
উর্ধ্বে তুলি কলঙ্কিত করিছে প্রভাত ;
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষে।

থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ও পারে দেয় শিস।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে!
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তরমাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্য লোকের কোন বাক্যের-অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।
বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়,
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে—
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।

কতবার মনে ভাবি কী যে সে কে জানে!
মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে

এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বৎসর-অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি—
মনে ভাবি এই সুর প্রত্যহের অবরোধ-'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে,
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবীযুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই;
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

শান্তিনিকেতন
৪ জানুয়ারি ১৯৪০

রূপকথায়

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ-কথার—

পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে।

সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

অসম্ভব

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে ভাবিনু মনে
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণীনদীর তরল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে বৈভব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।

যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণী-বাঁধনের মালায় পেতেম যে সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

ভাবনার স্রোতে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে বাতায়নে।
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের-আভাসে-জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

শ্রাদ্ধ

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই,
হাসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, 'ভয় নাই!'
সে বলে, 'সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য।'
দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারই শ্রাদ্ধ!
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচা তেঁতুল দরকার,
বেগুন-মুলোর সন্ধানেতে ছুটল ক্যাড়া সরকার।
বেগুন মুলো পাওয়া যাবে নিল্‌ফামারির বাজারে;
নগদ দামে বিক্রি করে, তিন টাকা দাম হাজারে।
ডুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল, বানিয়ে দেবে মুড়কি;
সন্দেহ হয়, ওজন-মত মিশল তাতে গুড় কি।
সবে যে চাই মোন দু-তিনেক খোজে খালে বাটনায়;
কালুবাবু তারি খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।

বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
তারি সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গম-ভাঙানির খুদ।
ওই শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি-
দেশ-বিদেশে শহর-গ্রামে গলা কাটার ধুম কী!
খাঁচায়-পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে;
সকাল থেকে নাম করে গান— হরে কৃষ্ণ হরে॥

বালুর চরে আলুহাটা, হাতে বেতের চুপড়ি,
ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে কালু মুলো নিল উপড়ি।
নদীর পাড়ে কিচির-মিচির লাগালো গাঙশালিক যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলোক্ষেতের মালিক যে।
কাঁকুর-ক্ষেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি,
কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্রলেখা উল্কি-দেওয়া আঁকনটা।
কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে—
মেছুনি তার সাত-গুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ও পারেতে খড়্গাপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুন্সিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।
রেডিয়োতে খবর জানায় বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে; বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে॥

হুইস্‌ল্ দিল প্যাসেঞ্জারে; সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার
মাথায় মোছে হাতের কালি, সময় না পায় নাইবার।

নন্দ গেল খুঘুডাঙায়, সঙ্গে গেল চিন্তে—
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাটাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল খোঁজাই।
নন্দ পরল রাঙা চেলি, পাল্কি চড়ে চলল ;
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাঘরা।
জমাদারের মামা পরে শুঁড়-তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাং খটাং ;
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।
খয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা ;
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়— যমালয়ের পয়দা।
আকাশ থেকে নামল বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়—
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে ; ছিরকুটে খায় পোকা।
শিস দেয় সে মধুর স্বরে— হাততালি দেয় খোকা॥

হুইস্‌ল্ বাজে ইস্‌টিশনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে— গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই!
সাঁতরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে লেজ দুলিয়ে নাচে—
শুধোয় নাচন, 'সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে ?'
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে ;
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলা ব্যাঙ,
খড়্গপুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাড্যাঙ ড্যাঙ।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা, কলমিপাড়ের পুকুর—

জল খেয়ে যায় এক-পা-কাটা তিন-পেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্ বাজে— আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়ালকাটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।
গ্যাঁ গ্যাঁ করে রেডিয়োটা— কে জানে কার জিত,
মেশিন্‌গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।
টিয়ের মুখে বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে—
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে॥

দিন চলে যায় গুন্‌গুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
শান-বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মউ,
হীরেদাদার মড়্‌মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।
পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে—
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়-পুতুলের বিয়ে;
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কম্‌লাপুলির টিয়ে।
ছায়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পাল্কিহাটে বেতো ঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।
তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাত-পুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঝুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেচোয়-দানোয়-পাওয়া।

ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির, নয় সে পরিষ্কার—
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-ঘুণে-ফুক্‌রো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে—
লোকে বলে 'সত্যি নাকি'— ঘুমোয় বলতে বলতে॥

সিন্ধুপারে চলছে কোথায় উলট-পালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড!
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে;
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতে হতেছে ক্রোশ পার—
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এস্‌পার ওস্‌পার॥

শান্তিনিকেতন
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

মামলা

বাসাখানি গায়ে লাগা আর্মানি গির্জার
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার!
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁশে,
নালিশটা কী নিয়ে যে জানে না তা কেহ সে।
সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তক্‌রার—
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
কিংবা মিয়াঁও ব'লে খাবা তুলে ডেকেছিল,
তখন সামনে তার দু ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে।

কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে
চাই চাই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাচ মারে কুস্তির—
জজসা'ব কী করে যে থাকে বলো সুস্থির॥

সমন হয়েছে জারি ; কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চড়ে, পিছে ঝাড়ুবর্দার।
উটেতে কামড় দিল— হল তার পা টুটা ;
বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।
বাজারে মেলে না আর আখরোট খোবানি ;
কাঁউসিল-ঘরে অক্তে কী নাকানি-চোবানি !
ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণাবিভাগে—
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়ীতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা— মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জারগুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি !
এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি,
নাইলতটিনীতটবিহারিণী কিশোরী !
রোঁয়াতে সে ইরানি যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্‌ডনেতে।
বাঙালি থিসিস্‌গুলো পড়ে গেছে ভাবনায়,
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।
আর্মানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক-তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।
কেম্‌ব্রিজ খালি হল, আসে সব স্কলারে—

কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে !
বিজ্ঞানীদল এল বলিন ঝাঁটিয়ে,
হাত-পাকা, জন্তুর-নাড়িভুঁড়ি-ঘাঁটিয়ে ॥

জজ বলে, 'বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদালতে আনা চাই।'
বিড়ালের দেখা নাই— ঘরেও না, বনে না।
মিয়াঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে, 'সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো ?'
পেয়াদা বললে, 'লেজ গেছে মিউজিয়মে
প্রিভিকৌঁসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে।'
জজ বলে, 'গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান।'
পেয়াদা বললে, 'তারো নয় বড়ো কম মান ;
মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যত্নেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।'
বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ ;
জজ বলে, 'তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ !'
তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পাচারি,
থেকে থেকে হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, 'গেল কোথা ফরিয়াদি আসামি ?'
'হুজুর' পেয়াদা বলে, 'বেটাদের চাষামি।—
শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়,
বলে গেছে, 'আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায়'।
কণ্ঠে এমনি ফাঁস এঁটে দিল জড়িয়ে,
মোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে।'

শান্তিনিকেতন
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

বরণ

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ—
জানে তা কি এ কালিম্পঙ?।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ—
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ?।

কালিম্পঙ
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

জপের মালা

একা বসে আছি হেথায় যাতায়াতের পথের তীরে
যারা বিহান বেলায় গানের খেয়া আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্য নাটে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা মিলায় ধীরে।

আজকে তারা এল আমার স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে,
সুরহারা সব ব্যথা যত একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়, বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে॥

জোড়াসাঁকো
৩০ অক্টোবর ১৯৪০

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন, ভুলে যাবে তার মানে।
কর্মক্লান্ত পথিক যখন বসিবে পথের ধারে
এই রাগিণীর করুণ আভাস পরশ করিবে তারে,
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু;
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে, বুঝিবে না আর কিছু—
বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই তাই সে পেয়েছে খুঁজি॥

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর ১৯৪০

খুলে দাও দ্বার

খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়;
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;

এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে,
তারি পুণ্য-অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ওই নীলিমার বুকে॥

শান্তিনিকেতন
২৮ নভেম্বর ১৯৪০

ধূসর গোধূলিলগ্নে

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ—
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে॥

শান্তিনিকেতন
৪ ডিসেম্বর ১৯৪০

পথের শেষে

করিয়াছি বাণীর সাধনা দীর্ঘকাল ধরি;
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।

নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম।
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম॥

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ
চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।
আজ সব কথা
মনে হয় শুধু মুখরতা।
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়,
সকল সংশয়তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়,
লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে
ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে॥

দিনশেষে কর্মশালা ভাষায়রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা, বহু মিছে।

বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।
এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেভাবে কি ভেসে?
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি,
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত, অজানা-তীর্থ-গামী॥

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু-মাঝে।
প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে সেই একা,
চেয়ে আছি, পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী—
তারি তীর হতে আমি আপনারই শুনি পদধ্বনি।
অসীম পথের পান্থ এবার এসেছি ধরা-মাঝে

মর্তজীবনের কাজে।
সে পথের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে
সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।
মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

শান্তিনিকেতন
২১ জানুয়ারি ১৯৪১

ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন,
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—

এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।

সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন-অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,

তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক ;
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।
এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্‌ মনের ;
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার ;
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার

অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারই
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি-
আমি বার'বার
তোমারে করিব নমস্কার॥

শান্তিনিকেতন
২১ জানুয়ারি ১৯৪১

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকূতি;
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ—
করে থাকে চুপ।

বলে, আমি আনন্দিত। ছন্দ যায় থামি।
বলে, ধন্য আমি।

শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি ১৯৪১

ঘণ্টা বাজে দূরে

ঘণ্টা বাজে দূরে।
শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার
মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল;
আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
প্রাচীন অশথতলা,
খেয়ার আশায় লোক ব'সে
পাশে রাখি হাটের পশরা।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর,
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি
পাটের বোঝাই ভরা;
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে;
লেজের চামর হানে পিঠে।

শর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলেনৌকো এল ঘাটে ,
ঝুড়ি কাঁখে ছুটেছে মেছুনি ,
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনি নৌকোগুলো ঢালু তটে বাঁধা পাশাপাশি ;
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে ,
আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষি ভেসে চলে
ও পারে ধানের ক্ষেতে।
অদূরে বনের ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া
ঝলিছে প্রভাতরৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁওয়ায় মেলি
দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে
দু-পহর রাতি
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে ;
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য-তীরে-তীরে,
কচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের ,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল —

দুই-পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরন ;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক্ হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা ;
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার ক্ষেতে ;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণবালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহু দূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণ-টানা মাল্লা একসারি।
জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেলা।
গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে,
তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম,
নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া—
রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।
ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলু কুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে—
মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা সুর।

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই-সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

শান্তিনিকেতন
৩১ জানুয়ারি ১৯৪১

সংসারের প্রান্ত-জানালায়

একা ব'সে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।
পথরেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালাদ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষ তীর্থ মন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।

শান্তিনিকেতন
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

ওরা কাজ করে

অলসসময়ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে।
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল
এসেছে মোগল;
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ;
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন— গুন্ গুন্ স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

শান্তিনিকেতন
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

মধুময় পৃথিবীর ধূলি

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।'

শান্তিনিকেতন
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

পিয়ারি

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি
খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
আমি শুধালেম তারে, 'এসেছ কী লাগি?'
সে কহিল চুপে চুপে, 'কিছু নাহি মাগি।
আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে,
আমার এ আলোটিতে মন লহো ভরে।
আমি যে তোমার দ্বারে করি আসা-যাওয়া,
তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।

যখন ফুটিয়া ওঠে যুথী বনময়,
আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়।
যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে,
আমার পরশ পেলে খুশি হয়ে ওঠে।
শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাকো একা,
আমিই দেখাই তারে ঠিকমত দেখা।
যখনি আমার শোনে নূপুরের ধ্বনি
ঘাসে ঘাসে শিহরন জাগে যে তখনি।
তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি,
কানাকানি করে তারা 'এসেছে পিয়ারি'।
অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে,
'এসেছে পিয়ারি' ব'লে বন ওঠে জেগে।
পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল,
'পিয়ারি পিয়ারি' রবে ওঠে উতরোল।
আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,
চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে।
শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,
কূলে কূলে গেয়ে চলে 'পিয়ারি পিয়ারি'।'

শান্তিনিকেতন
৩ মার্চ ১৯৪১

রূপ-নারানের কূলে

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—

চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

শান্তিনিকেতন
রাত্রি। ১৩ মে ১৯৪১

প্রথম দিনের সূর্য

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি ?
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি ?
পেল না উত্তর।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
সকাল। ২৭ জুলাই ১৯৪১

দুঃখের আঁধার রাত্রি

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু—
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হারজিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা—
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
বিকাল। ২৯ জুলাই ১৯৪১

তোমার সৃষ্টির পথ

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
সকাল সাড়ে নটা
৩০ জুলাই ১৯৪১

চতুর্থ সংস্করণের

বিজ্ঞপ্তি

সঞ্চয়িতার ইতিপূর্বে তিনটি সংস্করণ হইয়াছে। বিভিন্ন সংস্করণে কবিকর্তৃক গৃহীত ও বর্জিত কবিতার বিশদ তালিকা গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হইল। বর্তমান সংস্করণে পূর্ববর্তী সব সংস্করণের সব কবিতাই রক্ষা করা গেল; একবার নির্বাচিত অথচ বারান্তরে বর্জিত কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষও পরিহার করা হইল না। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই কবি লিখিয়াছেন, 'আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীতমনে আত্মসংবরণ করেছি।' পরবর্তী সমুদয় বর্জনের তাহাই প্রধান হেতু বলিয়া মনে হয়।

সঞ্চয়িতার শেষ সংস্করণের পর কবির যে সমস্ত নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে কবিতা চয়ন করিয়া সংযোজন-রূপে দেওয়া হইল।

প্রচলিত কাব্যগুলির নাম-রূপের নির্দিষ্ট সীমা মানিয়া রচনাগুলি যথাসাধ্য কালক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

সঞ্চয়িতার বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করিবার ভার শ্রীকানাই সামন্তর উপর অর্পিত হইয়াছিল।

চৈত্র ১৩৫০ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থপরিচয়

সঞ্চয়িতার প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ সালে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী হইতে মহুয়া অবধি সাতাশখানি কাব্যগ্রন্থ হইতে কবি স্বয়ং কবিতা সংকলন করেন। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে যেমন এক দিকে নূতন কাব্যগ্রন্থ হইতে নূতন কবিতা সংকলন করা হয় তেমনি আর-এক দিকে পূর্বসংকলিত অনেক কবিতা বর্জিত হয় এবং এমন কতকগুলি নূতন কবিতাও গ্রহণ করা হয় যাহা পূর্বেই সংকলিত হইতে পারিত। সঞ্চয়িতার পূর্ববর্তী তিন সংস্করণের এইরূপ গ্রহণ ও বর্জনের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।—

সংকলিত

প্রথম সংস্করণে

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী হইতে মহুয়া অবধি সাতাশখানি কাব্যের নির্বাচিত কবিতা

দ্বিতীয় সংস্করণে

বনবাণী, পরিশেষ, পুনশ্চ কাব্যের নির্বাচিত কবিতা।

বিদায়-অভিশাপ
শিবাজি-উৎসব
সুপ্রভাত
নমস্কার
পথের বাঁধন : মহুয়া
মিলন : মহুয়া

তৃতীয় সংস্করণে

বিচিত্রিতা, শেষ সপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী কাব্যের নির্বাচিত কবিতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : পূরবী
আফ্রিকা

বর্জিত

দ্বিতীয় সংস্করণে

কড়ি ও কোমল :	হৃদয়-আসন
মানসী :	পুরুষের উক্তি
	অপেক্ষা
চিত্রা :	নগরসংগীত
কণিকা :	মোহ
গীতাঞ্জলি :	আষাঢ়সন্ধ্যা
	বেলাশেষে
	অরূপরতন
	স্বপ্নে
	সহযাত্রী
	প্রতিস্পষ্টি
	যাবার দিন
	শেষ নমস্কার
গীতিমালা :	পথ-চাওয়া
	ভাসান
	খড়্গ
	সুর

বর্জিত
দ্বিতীয় সংস্করণে

গীতিমাল্য : দিনান্ত
ব্যর্থ
সার্থক বেদনা
উপহার
গানের পারে
নিঃসংশয়
সুরের আগুন
গানের টান
অতিথি
নিবেদন
আলোকধেনু

গীতালি : পরশমণি
শরন্ময়ী
মোহন মৃত্যু
শারদা
জয়
ক্লান্তি
পথিক
পুনরাবর্তন
সুপ্রভাত
পথের গান
সাথি
জ্যোতি

শিশু ভোলানাথ : তালগাছ
পূরবী : অতিথি

বর্জিত
তৃতীয় সংস্করণে

প্রভাতসংগীত : সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়
প্রভাত-উৎসব

কড়ি ও কোমল : পুরাতন
নূতন

মানসী : ক্ষণিক মিলন
চিত্রা : সিন্ধুপারে
চৈতালি : উৎসর্গ
ক্ষণমিলন

কল্পনা : ঝড়ের দিনে
কাহিনী : নরকবাস
ক্ষণিকা : কবির বয়স
জন্মান্তর

শিশু : খেলা
কেন মধুর
বিদায়
পরিচয়

উৎসর্গ : জন্ম ও মরণ
খেয়া : আগমন
প্রচ্ছন্ন

গীতাঞ্জলি : বর্ষার রূপ
ধুলামন্দির

পলাতকা : ঠাকুরদাদার ছুটি
বনবাণী : বৃক্ষবন্দনা
কুটিরবাসী

পুনশ্চ : পুকুরধারে

সঞ্চয়িতায় যে-সকল গ্রন্থের কবিতা সংকলিত হইয়াছে, গ্রন্থাকারে, স্থলবিশেষে বিভিন্ন কাব্যসংকলনে, তাহাদের প্রকাশকাল দেওয়া গেল।—

সন্ধ্যাসংগীত। ১২৮৮ বঙ্গাব্দ
প্রভাতসংগীত। ১২৯০ বৈশাখ
ছবি ও গান। ১২৯০ ফাল্গুন
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ১২৯১
কড়ি ও কোমল। ১২৯৩
মানসী। ১২৯৭ পৌষ
সোনার তরী। ১৩০০
চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ। ১৩০১
চিত্রা। ১৩০২ ফাল্গুন
চৈতালি। কাব্যগ্রন্থাবলী। ১৩০৩ আশ্বিন
কণিকা। ১৩০৬ অগ্রহায়ণ
কথা। ১৩০৬ মাঘ
কাহিনী। ১৩০৬ ফাল্গুন
কল্পনা। ১৩০৭ বৈশাখ
ক্ষণিকা। ১৩০৭ শ্রাবণ
নৈবেদ্য। ১৩০৮ আষাঢ়
স্মরণ। কাব্যগ্রন্থ : ষষ্ঠ ভাগ। ১৩১০
শিশু। কাব্যগ্রন্থ : সপ্তম ভাগ। ১৩১০
উৎসর্গ। কাব্যগ্রন্থ। ১৩১০
খেয়া। ১৩১৩ আষাঢ়
গীতাঞ্জলি। ১৩১৭ শ্রাবণ
গীতিমাল্য। ১৩২১
গীতালি। ১৩২১
বলাকা। ১৩২৩
পলাতকা। ১৩২৫ অক্টোবর
শিশু ভোলানাথ। ১৩২৯
পূরবী। ১৩৩২ শ্রাবণ
লেখন। ১৩৩৪ কার্তিক
মহুয়া। ১৩৩৬ আশ্বিন
সহজ পাঠ। ১৩৩৭ বৈশাখ
বনবাণী। ১৩৩৮ আশ্বিন
পরিশেষ। ১৩৩৯ ভাদ্র
পুনশ্চ। ১৩৩৯ আশ্বিন
বিচিত্রিতা। ১৩৪০ শ্রাবণ
শেষ সপ্তক। ১৩৪২ বৈশাখ
বীথিকা। ১৩৪২ ভাদ্র
পত্রপুট। ১৩৪৩ বৈশাখ
শ্যামলী। ১৩৪৩ ভাদ্র
খাপছাড়া। ১৩৪৩ মাঘ
ছড়ার ছবি। ১৩৪৪ আশ্বিন
প্রান্তিক। ১৩৪৪ পৌষ
সেঁজুতি। ১৩৪৫ ভাদ্র
প্রহাসিনী। ১৩৪৫ পৌষ
আকাশপ্রদীপ। ১৩৪৬ বৈশাখ
গীতবিতান। ১৩৪৮ মাঘ
নবজাতক। ১৩৪৭ বৈশাখ
সানাই। ১৩৪৭ [শ্রাবণ]
রোগশয্যায়। ১৩৪৭ পৌষ
আরোগ্য। ১৩৪৭ ফাল্গুন
জন্মদিনে। ১৩৪৮ বৈশাখ
গল্পসল্প। ১৩৪৮ বৈশাখ
ছড়া। ১৩৪৮ ভাদ্র
শেষ লেখা। ১৩৪৮ ভাদ্র *
স্ফুলিঙ্গ। ১৩৫২ [ভাদ্র]

সঞ্চয়িতার অনেক কবিতাই কবিকর্তৃক অল্পবিস্তর সংস্কৃত হয়। প্রথমাবধি অনেক কবিতার কয়েক ছত্র বা কয়েক স্তবক বাদ দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তী সংস্করণেও এরূপ আংশিক বর্জনের ও সংস্কারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্তমান সংস্করণে পূর্ববর্তী সমুদয় সংস্করণের সমস্ত কবিতাই মুদ্রিত হইল; একবার নির্বাচিত কিন্তু বারান্তরে বর্জিত অংশগুলিও ত্যাগ করা হইল না।

বর্তমান গ্রন্থে কাব্যগ্রন্থগুলির অথবা নির্বাচিত কবিতাগুলির সন্নিবেশে যথাসাধ্য রচনার কালক্রম অনুসৃত।

রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ, সঞ্চয়িতার বিভিন্ন সংস্করণ, সাময়িক পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া সংগত-পাঠ-নির্ধারণে যত্ন করা হইয়াছে।

অনেক কাব্যগ্রন্থে কবিতার শিরোনাম নাই। সঞ্চয়িতায় সংকলন-কালে কবিতার সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নাম গৃহীত হইয়াছে বা কবি স্বয়ং নূতন নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। আবশ্যকস্থলে বর্তমান সংস্করণেও সাময়িক পত্র ও পাণ্ডুলিপি হইতে আর-কতকগুলি নাম গ্রহণ করা হইল।

নির্বাচিত রচনাবলী সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি নিম্নে মুদ্রিত হইল। প্রত্যেক প্রসঙ্গসূচনায় এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক এবং কাব্য বা কবিতার নাম উল্লিখিত।

২৯-৩১ ভানুসিংহের পদাবলী -রচনার কাহিনী জীবনস্মৃতিতে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ রচনা সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী। 'মরণ' ভারতী পত্রিকার ১২৮৮ শ্রাবণ সংখ্যায় এবং ছবি ও গানের প্রথম সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত। 'প্রশ্ন' ১২৯২ সালের প্রচার পত্রিকায় এবং কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত। এই দুটি পরে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থে স্থান পায়।

৩২ দৃষ্টি। ইহা সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের 'উপহার' কবিতার প্রথম স্তবক হইতে সংকলিত; বর্জিত প্রথম কয় ছত্র এই—

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে;

স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যা-সম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।

৩২ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সংক্ষিপ্ত পাঠ। মূলতঃ ভারতী পত্রিকার ১২৮৮ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩৬ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। ভারতী পত্রিকার ১২৮৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত; বর্তমান পাঠ সংক্ষিপ্ত ও সংস্কৃত। জীবনস্মৃতির 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায়ে কবি লিখিয়াছেন—

[সদর স্ট্রীটের বাড়িতে থাকিবার কালে] একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছ-গুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নিঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনও যবনিকা পড়িয়া গেল না।

৩৮ প্রভাত-উৎসব। সংক্ষিপ্ত পাঠ। মূলতঃ ভারতী পত্রিকার ১২৮৯ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতির 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায়ে কবি লিখিয়াছেন—

এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে, কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে— সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে,

ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না॥

৩৯ রাহুর প্রেম। প্রথমাবধি সংক্ষেপ-কৃত ও সংস্কৃত পাঠ।

৪২।৪৪ পুরাতন। নূতন॥ যথাক্রমে ভারতী পত্রিকার ১২৯১ চৈত্র ও ১২৯২ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪৬ বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। বালক পত্রের ১২৯২ বৈশাখে মুদ্রিত।

৫০ হৃদয় আকাশ। 'ধরা দিয়েছি গো আমি' গানের কথায় এই কবিতারই ১-৮ ছত্রের ঈষৎ-পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়।

৫৭।৯৭ বিরহানন্দ। ক্ষণিক মিলন॥ 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বিফল মিলন' কবিতা তুলনীয়। উহার তৃতীয় স্তবক হইতে শেষ স্তবক পর্যন্ত লইয়া মানসী কাব্যের 'বিরহানন্দ' কবিতা। অবশ্য, সঞ্চয়িতায় মাঝের দুটি স্তবক নাই। 'বিফল মিলন' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকই মানসীর অন্তর্গত 'ক্ষণিক মিলন' কবিতার তৃতীয় স্তবক। সঞ্চয়িতায় 'ক্ষণিক মিলন' কবিতার শেষ স্তবক সংকলিত হয় নাই।

৬০ সিন্ধুতরঙ্গ। প্রকাশ: ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪। উল্লিখিত ঘটনা-কাল ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ বা ২৫ মে ১৮৮৭।

৬৪ নিষ্ফল কামনা। সঞ্চয়িতায়-বর্জিত প্রথম স্তবক—

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা॥

৮১ গুপ্তপ্রেম। এখানে, মানসীতে প্রকাশিত কবিতার ছয়টি স্তবক বর্জিত।

৮৯ ভৈরবী গান। ঐরূপ এই সংকলনে একটি স্তবক বর্জিত।

১০৭ আমার সুখ। মানসী কাব্যের শেষ কবিতার শেষ দুই স্তবক। রচনাকাল (১২ কার্তিক) পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় নির্ধারিত।

১০৮ সোনার তরী। এক কালে ইহার তাৎপর্য লইয়া বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শান্তিনিকেতন গ্রন্থের 'তরী বোঝাই' নিবন্ধে কবি স্বয়ং এই-ভাবে রচনাটির ব্যাখ্যা করেন—

'সোনার তরী' ব'লে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।— মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো, চারি দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে— সেইজন্য গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারি দিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই ক'রে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ওই সঙ্গে আমাকেও নাও' 'আমাকেও রাখো' তখন সংসার বলে, 'তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'— প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না; কিন্তু মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই-যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনা-স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে; ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়। ৪ চৈত্র ১৩১৫

'সোনার তরী' কবিতা যে প্রাকৃতিক পরিবেশের স্মৃতিতে লেখা হইয়াছে কবিকর্তৃক তাহার উল্লেখ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

পত্রে পাওয়া যায়—

ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ও পারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা-ধানে-বোঝাই চাষিদের ডিঙিনৌকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান।··· ··· ভরা পদ্মার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

১০৯ নিদ্রিতা। 'রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে' ইত্যাদি প্রথম স্তবক সংকলনে বর্জিত হইয়াছে।

১২০ পরশপাথর। সঞ্চয়িতার দ্বিতীয় সংস্করণে তৃতীয় স্তবক বর্জিত।

১২৪ দুই পাখি। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'নরনারী' নামে প্রকাশিত, জীবনস্মৃতির 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে কবি নিজের শৈশব স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এ দিক ও দিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ। মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি [ভৃত্য শ্যামের আঁকা] মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনও দূরে, বাহির এখনও বাহিরেই।

ইহার পর কবি-কর্তৃক এই কবিতার প্রথম স্তবক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১২৬ গানভঙ্গ। রচনাকাল ২৪ আষাঢ় [১২৯৯]। পাণ্ডুলিপিতে অব্দ লেখা নাই। কিন্তু এটি যে স্বপ্নলব্ধ কাহিনী তাহা ২০ আষাঢ় ১২৯৯ তারিখের পত্রে (ছিন্নপত্র / ছিন্নপত্রাবলী) জানা যায়, আর 'সভাভঙ্গ'

শিরোনামে ইহার প্রথম প্রকাশ সাধনা পত্রিকার ১২৯৯ চৈত্র-সংখ্যায়। সোনার তরী কাব্যের প্রথম প্রকাশ হইতেই '২৪ আষাঢ় ১৩০০' ভুল ছাপা হইতেছে সন্দেহ নাই। রচনার কালক্রমে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

১৩৬ মানসসুন্দরী। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে লিপিবদ্ধ আছে—

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী— বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরি করেছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত; কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা বদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়; আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। 'সাধনা'ই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান। শিলাইদহ। ৮ মে ১৮৯৩

১৫৪ সমুদ্রের প্রতি। পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় জানা যায় কবি পুরীতে প্রথম সমুদ্র দর্শন করেন ২ ফাল্গুন ১২৯৯ তারিখে। পুরীতে গমনের কতক বিবরণ আছে ছিন্নপত্রাবলী-ধৃত ৪ ফাল্গুন ১২৯৯ তারিখের চিঠিতে। এই কবিতার রচনাকাল ১৭ চৈত্র ১২৯৯। ইহার সহিত অল্পকাল পরে (৪ বৈশাখ ১৩০০ তারিখে) লেখা ছিন্নপত্র গ্রন্থের ৭৭-সংখ্যক পত্র তুলনীয়—

কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র… … এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়? পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের সৃষ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক, কত বিশ্বাসসন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি— মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। কলিকাতা। ১৬ এপ্রিল ১৮৯৩

১৮৮ বসুন্ধরা। বৃহৎ ধরণীর প্রতি যে নাড়ীর টানের উল্লেখ এই কবিতায় ও অন্যত্র দেখা যায় সে সম্পর্কে ছিন্নপত্র গ্রন্থের ৬৪-সংখ্যক পত্রে (৫ ভাদ্র ১২৯৯ তারিখে চিঠিখানি লেখা, আর 'বসুন্ধরা'র রচনাকাল: ২৬ কার্তিক ১৩০০) বলা হইয়াছে—

এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার

সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম— তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে-শিকড়ে শিরায়-শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো ক'রে প্রকাশ করতে— কিন্তু, ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে। শিলাইদহ ২০ অগস্ট ১৮৯২

২০১ বিদায়-অভিশাপ। সাধনা পত্রিকার ১৩০০ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। পঞ্চভূত গ্রন্থে 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। কবিতার ভূমিকাটি নিম্নে সংকলিত হইল—

দেবগণ-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎ-সমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্য গীত বাদ্য -দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জন-পূর্বক সিদ্ধ-কাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার পরে বিবৃত হইল।

২১৬ প্রেমের অভিষেক। সাধনা পত্রিকার ১৩০০ ফাল্গুন সংখ্যায় সম্পূর্ণ অন্য পাঠ দৃষ্ট হয়। কবির ৬.১২.১৩০২ তারিখের এক পত্রে প্রকাশ—

গ্রন্থে সংকলিত পাঠই ইহার প্রথম পাঠ। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডু-লিপিতে এই পাঠই দেখা যায়। নিম্নে সাধনায়-প্রকাশিত পাঠ সংকলিত হইল।—

প্রেমের অভিষেক

কী হবে শুনিয়া, সখী, বাহিরের কথা—
অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা
যত-কিছু! লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার,
কোথা আমি যুঝে মরি এক পার্শ্বে তার
এককণা অন্ন লাগি! প্রাণপণ করি
আপনার স্থানটুকু রেখেছি আঁকড়ি
জনস্রোত হতে। সেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন; সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্রভার; কভু অনুগ্রহ
কভু অবহেলা সহিতেছি অহরহ—
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া নাহি জানি
কোন্ ভাগ্যগুণে। অয়ি মহীয়সী রানী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। কেন,
সখী, নত কর মুখ? কেন লজ্জা হেন
অকারণে? নহে ইহা মিথ্যা চাটু। আজি
এই-যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে—
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধা-পানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর? ক্ষুদ্র আমি
কর্মচারী; বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী—
কঠোর কটাক্ষ-পাতে উচ্চে বসি হানে
সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,

মোর দুঃখ নাহি মানে— রাজপথে যবে
রথে চড়ি ছুটে চলে সৌভাগ্যগরবে
অজস্র উড়ায়ে ধূলি, মোর গৃহ কভু
চিনিতে না পারে। মনে মনে বলি, 'প্রভু,
যাও ছুটে যাও; খেলো গিয়ে খেলাঘরে;
করো নৃত্য দীপালোকে প্রমোদসাগরে
মত্ত ঘূর্ণ্যবেগে, তপ্তদেহে অর্ধরাত্রে
সঙ্গিনীরে লয়ে; উচ্ছ্বসিত সুরাপাত্রে
তুষার গলায়ে করো পান, থাকো সুখে
নিত্যমত্ততায়।' এত বলি হাস্যমুখে
ফিরে আসি আপনার সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা
আনন্দমন্দির-মাঝে, নিভৃত নিরালা,
শান্তিময়।— প্রভু, হেথা কেহ নহ তুমি
আমি যেথা রাজা। আমার নন্দনভূমি
একান্ত আমার। দুর্লভ পরশখানি
দুর্মূল্য দুকূল সর্বাঙ্গে দিয়েছি টানি
সগৌরবে; আলিঙ্গনকুঙ্কুমচন্দন
সুগন্ধ করেছে বক্ষ; অমৃতচুম্বন
অধরে রয়েছে লাগি; স্নিগ্ধদৃষ্টিপাতে
সুধাস্নাত দেহ। প্রভু, হেথা তব সাথে
নাহি মোর কোনো পরিচয়॥

অয়ি প্রিয়ে,
ধন্য আমি, আপনাতে রেখেছি ভরিয়ে
তব প্রেম— রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি, বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার

সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট।
কী দেখিছ মুখে মোর পরমবিস্মিত,
ডাগর নয়ন মেলি? হে আত্মবিস্মৃত,
আপনারে নাহি জানো তুমি; মোর কথা
নারিবে বুঝিতে। বড়ো পেয়েছিনু ব্যথা
আজি, বড়ো বেজেছিল অপমান, যবে
অপোগণ্ড সাহেব-শাবক রূঢ়রবে
করিল লাঞ্ছনা। হায়, একি প্রহসন
এ সংসার! ক্ষুদ্র ব্যক্তি বড়ো সিংহাসন
কার পরিহাসবশে করে অধিকার?
কোন্ অভিনয়চ্ছলে নিখিল সংসার
বড়ো বলি মান্য করে তারে? মিথ্যা আজ
যত চেষ্টা করি আমি, সমস্ত সমাজ
এক হয়ে নত ক'রে রাখিবে আমারে
তার কাছে— গণ্য আমি নাহি করি যারে
সমকক্ষ, একাকী যে যোগ্য নহে মোর।
জেনো, প্রিয়ে, বাহিরের প্রকাণ্ড কঠোর
সংসার এমনিধারা অদ্ভুত-আকার,
কে যে কোথা পড়িয়াছে স্থির নাহি তার
অস্থানে অকালে। আর্তনাদে অট্টহাসে
চলেছে উৎকট যন্ত্র অন্ধ ঊর্ধ্বশ্বাসে
দয়ামায়াশোভাহীন— বিরূপ ভঙ্গীতে
সর্বাঙ্গ নড়িছে তার, সৌন্দর্যসংগীতে
কে চালাবে তারে! সেথা হতে ফিরে এসে
স্মিতহাস্যসুধাস্নিগ্ধ তব পুণ্যদেশে,

কল্যাণকামনা যেথা নিয়ত বিরাজে
লক্ষ্মীরূপে, সেই তব ক্ষুদ্রগৃহ-মাঝে
বুঝিতে পেরেছি আমি ক্ষুদ্র নহি কভু ;
যত দৈন্য থাক্ মোর, দীন নহি তবু ;
তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট-মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্যলাজ
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ , সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। পূর্বে একদিন
বধির জীবন ছিল সংগীতবিহীন—
প্রেমের আহ্বানে আজি আমার সভায়
এসেছে বিশ্বের কবি, তারা গান গায়
মোদের দোঁহারে ঘিরি , অমরবীণায়
উঠিয়াছে কী ঝঙ্কার ! নিত্য শুনা যায়
দূরদূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।— অধুনিক রাজধানী,
আমি তারি আধুনিক ছেলে, ঘরে আনি
চাকুরির কড়ি, ফিরে আসি দিনশেষে
কর্ম হতে ; জন্মিয়াছি যে কালে, যে দেশে,

না হেরি মাহাত্ম্য কিছু— কোনো কীর্তি নাই—
তবু খ্যাতিহীন আমি কত সঙ্গী পাই
কত গৌরবের ! তব প্রেমমন্ত্রবলে
ইতর জনতা হতে কোথা যাই চলে
নবদেহ ধরি ! প্রেমের অমরাবতী—
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তীসতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদমর্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন-ম্লানমুখশশী,
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্ব-মাঝে ; মহারণ্যে যেথা
বীণা হস্তে লয়ে তপস্বিনী মহাশ্বেতা
শিবের মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনাসিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারি শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রুমন্দাকিনী, নিবৃত্তির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানমুখী করে
করুণায় ; বাঁশরির ব্যথাহিত তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথিরে— হাত ধ'রে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি

অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতা সমান ;
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা ;
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব-অর্থ-ভরা ; চির-সুহৃদ্-সমান
সর্বচরাচর॥

হেরো সখী, গৃহছাদে
জ্যোৎস্নার বিকাশ। এত জ্যোৎস্না এত সাধে
আর কোথা আছে! প্রভুদের সিংহাসন
রুদ্ধদ্বার অন্ধকারে করিছে যাপন
কর্মশালে কর্মহীন নিশি। এ কৌমুদী
আমাদের দুজনের। দুটি আঁখি মুদি
বারেক শ্রবণ করো— সুগম্ভীর গান
ধ্বনিতেছে বিশ্বান্তর হতে ; দুটি প্রাণ
বাঁধিছে একটি সুরে। স্তব্ধ রাজধানী
দাঁড়াইয়া নতশিরে, মুখে নাহি বাণী॥

উল্লিখিত পরিবর্তিত পাঠ সাধনায় ছাপা হইতে দেখিয়া (রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ উদ্ধৃত করা যাক)—

কাহারও কাহারও মনে এতই আঘাত করিয়াছিল যে, বন্ধু-বিচ্ছেদ হইবার জো হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন, কোনো আপিস-বিশেষের কেরানিবিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস-সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধ ভাবে দেখানো হয়—

সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমানক্ষুব্ধ নিরুপায় কেরানির মুখে এ কথাগুলো যেন কিছু অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মতো শুনায়; উহার সহজ স্বতঃপ্রবাহিত সর্ববিস্মৃত কবিত্বরসটি থাকে না; মনে হয় সে মুখে যতই বড়াই করুক-না কেন, আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এই-সমস্ত আলোচনাদি শুনিয়া, আমি গোড়ায় যেভাবে লিখিয়াছিলাম সেই ভাবেই প্রকাশ করিয়াছি। শিলাইদহ-কুমারখালি। ৬ চৈত্র ১৩০২

২১৯ এবার ফিরাও মোরে। তৃতীয় ছত্রে 'বিষন্ন' স্থলে 'নিষন্ন' পাঠ পাওয়া যায় 'সাধনা'য় (চৈত্র ১৩০০)— ইহা উল্লেখযোগ্য।

২২৪ মৃত্যুর পরে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'শান্তি' শিরোনামে ৭ ৫ বৈশাখ ১৩০১ তারিখ দিয়া পাণ্ডুলিপিতে মাত্র ৭টি স্তবক (স্তবক ১, ২, ৪, ৬, ৭, ২০, ২১), তাহার মধ্যেও স্তবক ৬ ও ৭ পরে সংযোজিত। ১৩০১ জ্যৈষ্ঠের 'সাধনা'য় প্রথম মুদ্রণাবধি ইহার বর্তমান রূপ বা ২১টি স্তবক পাওয়া যায়।

২৪১ নগরসংগীত। সাধনা পত্রিকার ১৩০২ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৫০ উর্বশী। ছিন্নপত্রাবলী দ্রষ্টব্য—

আজ ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল— উঠে কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বেলে উর্বশী-নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম— যখন সাড়ে সাতটা তখন স্নান করতে গেলুম— এমনি করে এই দুদিনে দুটি বেশ বড়সড় কবিতা শেষ করে ফেলেছি।

[শিলাইদহ-জলপথে, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২]

(অন্য কবিতাটি চিত্রা কাব্যেরই 'আবেদন'— এ অনুমান সংগত।)

রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী'র ভাবব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন—

নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য— সেইজন্য কোনো কর্তব্য

যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়।… সে নিছক নারী— মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়— যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই। মনে রাখতে হবে উর্বশী কে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী। দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক-না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপসৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহসৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চির-যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত— তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

২৬৫ জীবনদেবতা। এই কবিতায় নিখিল রবীন্দ্রকাব্যের যে বিশেষ তত্ত্বটি নিহিত, কবি সে সম্পর্কে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়কে একখানি চিঠিতে লেখেন—

যিনি 'আমি'-নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে, লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর হইতে, একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি আমাকে লইয়া অনাদিকালের ঘাট হইতে অনন্তকালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া চলিয়াছেন আমি জানি না, সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্যে আমি যাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীর ভাবে আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই, যিনি বিশেষরূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎসংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি যাঁহার, যিনি আমার অন্তরে এবং যাঁহার অন্তরে আমি, যাঁহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালোবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে

পারে না, চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে। আমি তাঁহারই কাছে আবেদন করিয়াছি যে, তোমার কাছে নানা লোক নানা বড়ো বড়ো পদ পাইয়াছে, আমি তাহার কোনোটা চাই না; আমি তোমার মালঞ্চের মালাকার হইব, আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে তোমার গোপন সেবায় নিযুক্ত থাকিব··· হিত-কার্য না করিতে পারি, যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করিতে পারিব॥ শিলাইদহ-কুমারখালি। ৬ চৈত্র ১৩০২

২৭০ সিন্ধুপারে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার ব্যাখ্যায় অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন—

যে প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখদুঃখের সম্বন্ধ, মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয়, সেই সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন ক'রে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেল। যে নিয়ে যায়, মৃত্যুর ছদ্মবেশে, সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাব চিরপরিচিত মুখশ্রী। কোনো পৌরাণিক পরলোকের কথা বলছি নে সে কথা বলা বাহুল্য, এবং কাব্যরসিকদের কাছে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে বিবাহের অনুষ্ঠানটা রূপক।

২৭৩ দুঃসময়। ইহার স্বর্গপথে-শীর্ষক পাণ্ডুলিপিচিত্রখানি একাধিক কারণে বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক দুঃসময় কবিতা হইতে বর্জিত হইয়া কল্পনা কাব্যেরই অসময় (১৩০৬) কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে রূপান্তরিত হইয়াছে।

২৭৫ বর্ষামঙ্গল। প্রথম স্তবকের শেষাংশের পূর্বপাঠ—

গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে,
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥

২৭৭-৭৮ 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতার পাঠ-নির্ধারণে, কবি গ্রামোফোন রেকর্ডে যেরূপ আবৃত্তি করিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করা হইল। প্রত্যেক স্তবকের শেষ ছত্রে, এতাবৎ মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠে 'সেই' থাকিলেও

কবি আবৃত্তি করেন : এই।

৩৩৯ পূজারিনি। মূলপাঠের প্রথম তিন স্তবক বর্জিত— সে সম্পর্কে 'কথা ও কাহিনী' কাব্য দ্রষ্টব্য। উত্তরকালে এই কাহিনীকে কবি 'নটীর পূজা' (১৩৩৩) নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন।

৩৪৩ পরিশোধ। এই কাহিনী লইয়া শ্যামা (১৩৪৬) নৃত্যনাট্য রচিত।

৩৭৫ গান্ধারীর আবেদন। রচনাকাল সম্ভবতঃ মাঘ ১৩০৪ ; কেননা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেন যে, সমকালীন এক সাপ্তাহিক পত্রে (সংসার : ৮ ফাল্গুন ১৩০৪ শনিবার) লেখা হয় এ কবিতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে 'গত শনিবার', অর্থাৎ ১ ফাল্গুন ১৩০৪ তারিখে, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পঠিত। ঐ সভায় 'মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি ছিলেন।··· কাব্যখানি বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী। সিডিশন আইন লইয়া রাজপুরুষেরা যেরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহার প্রতি এই কাব্যে কটাক্ষ আছে মনে হইতেছিল।'

এ বিষয়ে সন্ধান করিয়া, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট -কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, ইন্‌স্টিটিউট ম্যাগাজিনের ১৮৯৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ('Bengali Recitation' শিরোনামে) উক্ত সংবাদ সমর্থিত। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ (১ ফাল্গুন ১৩০৪) সন্ধ্যাকালে কবিতাপাঠের জন্য যে সভা হয় তাহাতে জগদীশচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিহারীলাল গুপ্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, আশুতোষ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৪০৪ উদ্‌বোধন। 'ক্ষণিকের গান' শিরোনামে ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে প্রকাশিত।

৪৪১।৪৪২ স্নায়দণ্ড। প্রার্থনা। বঙ্গদর্শনে ১৩০৮ বৈশাখে প্রকাশিত।

৪৪৫-৫৯ স্মরণ। ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ তারিখে কবির সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করেন ; তাঁহারই স্মরণে এই কাব্যগ্রন্থ রচিত এবং ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠ ভাগের অন্তর্ভুক্ত। সংকলিত কবিতার মধ্যে 'অতিথি' বঙ্গদর্শনের

১৩০৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সংরক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপিতে অন্য কবিতাগুলির রচনার স্থান বা কাল সম্বন্ধে জানা যায়।

৪৫৮।৪৫৯ পরিচয়। উপহার। যথাক্রমে ১২৯২ ফাল্গুনে ও চৈত্রে বালক মাসিক পত্রে প্রকাশিত ও পরে কড়ি ও কোমল কাব্যে (১২৯৩) সংকলিত— চিঠি (চিঠি লিখব কথা ছিল)। জন্মতিথির উপহার। শিশুতে গৃহীত তথা সঞ্চয়িতায় সংকলিত পাঠ এতই ভিন্ন যে, ইহাদের পৃথক্ কবিতাও বলা চলে।

৪৬১-৭৫ উৎসর্গ। ১৩১০ সালে প্রচারিত কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগের প্রবেশকগুলি এবং বিভিন্ন বিভাগের কতকগুলি কবিতা একত্র করিয়া ১৩২১ সালে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪৬৪ আমি চঞ্চল হে। মূল কবিতার দ্বিতীয় স্তবক বর্জিত।

৪৭০ মরণমিলন। বঙ্গদর্শনের ১৩০৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪৭৫ শিবাজি-উৎসব। ইহা শিবাজি-উৎসব উপলক্ষে ১৩১১ আশ্বিনের ভারতীতে ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। দীনেশচন্দ্র সেনকে কবি একখানি চিঠিতে লেখেন (দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১০): আজ… শিবাজি-উৎসব সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম। গিরিধি ১১ ভাদ্র ১৩১১

৫৩৯ শা-জাহান। রবীন্দ্রমানসে এই ভাব ও চিন্তাধারা কত সুদূরপ্রসারী তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ১২৯২ সালের বালক পত্রের ৪২৭-৩০ পৃষ্ঠা হইতে কবির একটি রচনার কিয়দংশ সংকলিত হইল—

জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে— এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে, যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শতসহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ 'এক'এর দিকে লইয়া যাইতেছে। সেইদিকেই আমাদিগকে

অগ্রসর হইতে হইবে, পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই… আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখো। সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার দুই-চারিটা চন্দ্র সূর্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না… অথচ একটি সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও তাহার অসীম হৃদয়ের সমস্ত যত্ন সমস্ত আদর স্থিতি করিতেছে, তাহার অনন্ত শক্তি কাজ করিতেছে… প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে সীল-মোহরের ছাপ মারিয়া 'আমার' বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে।… বিস্তৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না।[১] সোলাপুর। ২৬ আশ্বিন [১২৯২]

৫৫১-৭৪ পলাতকা। সংকলিত প্রথম চারিটি কবিতা ১৩২৫ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে প্রকাশিত।

৫৫৩ মুক্তি। সবুজ পত্রের ১৩২৫ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। ১৩২১

১ বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পথপ্রান্তে প্রবন্ধযুগল দ্রষ্টব্য। প্রথম প্রবন্ধটি উপলক্ষ করিয়া কবিবন্ধু অ[কম মণ্ডল ?] ও কবির মধ্যে যে 'উত্তর প্রত্যুত্তর' চলে তাহারই কিয়দংশ এ স্থলে উৎকলিত— পঞ্চদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে সবটা পাওয়া যাইবে। বর্তমান গ্রন্থে অধিক উদ্ধৃতির স্থান নাই, তবু 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধের বক্তব্যও যে অভিন্ন ('লক্ষ্যভ্রষ্ট' বা 'পা-আহ্বান' রচনা হইতে 'অভিন্ন') তাহারও নিদর্শন দেওয়া ভালো—

আর-কিছুই থাকে না, কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।… প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো… পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়।… মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান? অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের মাঝে লইয়া যায়— সেখানে শতকোটি সন্তান। [অগ্রহায়ণ ১২৯২]

শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম-প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের সহিত তুলনীয়।

৫৮০-৬০৮ পূরবী। সংকলিত প্রথম তিনটি বাদে সমস্ত কবিতাই ১৩৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ ও আমেরিকা -ভ্রমণকালে লিখিত।

৫৯১-৯৩ সাবিত্রী। যাত্রী পুস্তকে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে এই কবিতা সম্পর্কে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কবি লিখিতেছেন, 'কাল অপরাহ্নে ... শুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হল।' প্রবাসী পত্রিকায় ও পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত দুইটি স্তবক দেখা যায়।

৬১৩ কুটিরবাসী। ইহার ভূমিকা—

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু [অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেন] এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় ব'লেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়, বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে, যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

কবিতার পাণ্ডুলিপিতে আরম্ভেই এই তিনটি অপ্রকাশিত স্তবক পাওয়া যায়—

বাসাটি বেঁধে আছ মুক্তদ্বারে
বটের ছায়াটিতে পথের ধারে।
সমুখ দিয়ে যাই; মনেতে ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি—
হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে।

এখানে পথে-চলা পথিকজনা
আপনি এসে বসে অন্যমনা।

তাহার বলা সেও চলারই তালে,
তাহার আনাগোনা সহজ চালে ;
আসন লঘু তার, অল্প বোঝা—
সোজা সে চলে আসে, যায় সে সোজা।

আমি যে বাঁধি ভিত, বিরাম ভুলি
চূড়ার 'পরে চূড়া আকাশে তুলি।
আমি যে ভাবনায় জটিল জালে
বাঁধিয়া নিতে চাই সুদূর কালে—
সে জালে আপনারে জড়াই ঠেসে,
পথের অধিকার হারাই শেষে।

৬১৫ নীলমণিলতা। ইহার ভূমিকা—

শান্তিনিকেতন-উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা[১] রোপণ করেছিলেন। অনেক কাল অপেক্ষার পরে নীল ফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত, কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি— কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সেদিন রূপের স্মৃতি নামের দাবি করলে। ভক্ত ১০৮ নামে দেবতাকে ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

১ 'ইহার বিদেশী নাম পেট্রিয়া (Petria)।'

৬২০-২২ সাগরিকা। পাণ্ডুলিপিতে পঞ্চম স্তবকের পরেই আছে—

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণরাগে
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে—
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্‌বোধনমন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি যুগল করি পাণি ॥

কবিতাটি প্রবাসীর ১৩৩৪ পৌষ সংখ্যায় 'বালি' শিরোনামে প্রকাশিত, সেখানেও অতিরিক্ত স্তবকটি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বালি যবদ্বীপ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতভূমি -ভ্রমণের কালে ইহা রচনা করেন।

৬৩৭।৬৪২ পত্রলেখা। বাঁশি। পুনশ্চ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; এখানে রচনাকাল ও রচনাকলার বিচারে পূর্ববৎ পরিশেষ কাব্যেই রাখা গেল। ইহাদের ছন্দ সম্পর্কে পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকা হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে—

মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন, তরে সনে মোর প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি। ২ আশ্বিন ১৩৩৯

('পদ্যছন্দ আছে' কথাটি বিশেষ প্রণিধানের বিষয়।)

৬৪৫ জলপাত্র। ইহার সহিত চণ্ডালিকা (১৩৪০) নাট্যকাহিনীর প্রারম্ভ তুলনীয়।

৬৪৭-৫৪ বিচিত্রিতা। এক-একটি কবিতা এক-একখানি চিত্র উপলক্ষে লেখা। সংকলিত প্রথম চারিটি কবিতা ১৩৩৮ মাঘের রচনা, 'ছায়া' নামে ছায়াসঙ্গিনীর পূর্বপাঠ ১৩৩৮ ফাল্গুনের বিচিত্রায় প্রকাশিত— উভয়ের পাঠভেদ-প্রসঙ্গ সপ্তদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর

গ্রন্থপরিচয়ে আলোচিত।

৬১৪-৮০ পুনশ্চ। পুনশ্চ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা গদ্যছন্দে। এই ছন্দ সম্পর্কে কবির বক্তব্য 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'কাব্যে গদ্যরীতি' প্রভৃতি প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত। অপিচ পুনশ্চের ভূমিকা দ্রষ্টব্য—

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।... পরীক্ষা করেছি, লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে।... গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে-একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।
২ আশ্বিন ১৩৩৯

৭০০ নিমন্ত্রণ। ১৩৪২ আষাঢ়ের 'বিচিত্রা' পত্রিকা হইতে এই কবিতার একটি প্রাক্তন রূপ এখানে সংকলিত হইল।—

নিমন্ত্রণ

সংসার-কাজে ছুটি কিছু আছে হাতে
সেই ভরসায় ডাক দিনু এইখানে।
ইচ্ছাশক্তি যন্ত্রশক্তি -সাথে
মিশ্রিত কোরো রেলে বা মোটর -যানে।
আলাপ জমাব নিয়ে বহু বাজে কথা,
কাব্যগ্রন্থ অখোলা রহিবে কোলে।
গান চাও যদি গ্রামোফোনে শোনাব তা,
মাথা নেড়ে শুনো আমার রচনা হলে।

আরেকটা কথা বলে রাখি, জেনো তারে
ইম্‌পর্‌টাণ্ট্‌ নিশ্চয় যায় বলা—
তবু কহি শুধু অভ্যাস-অনুসারে
সংকোচবশে কিছু নিচু করে গলা।
এ কালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমী-রুমাল টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গন্ধজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়—
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়,
জেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ঐ দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা—
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।
তথাপি স্পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ পান্তোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও,
যবে দেখা দেয় সেবা-মাধুর্যে-ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।
ময়ান-মাখানো দু হাতে ময়দা ঠাসা,
তরকারী রাঁধা সিদ্ধ ক'রে বা ভেজে,
আয়োজনে তার ভালোবাসা পায় ভাষা—
ভোজনবেলায় স্পর্শ-অতীত সে যে।

বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক বলে,
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা
এ-সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফর্মাশ করা।
আচ্ছা, নাহয় ইঙ্গিত শুনে হেসো—
বরদানে, দেবি, নাহয় হইবে বাম—
খালি হাতে যদি আসো তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।

চন্দননগর
১৫ জুন ১৯০৫

৭০৫ কবির হস্তাক্ষরে—'পৃথিবী' কবিতার পূর্বতন একটি পাঠ শ্রীমতী সীতাদেবীর সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে ও বর্তমানে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে, উহারই মুদ্রিত প্রতিচিত্রে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ পরিবর্তন করিয়াই কবিতাটির প্রচলিত রূপ প্রবাসী পত্রে বা গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

৭২১ আফ্রিকা। সঞ্চয়িতায় কবিকর্তৃক ইহাই সর্বশেষ সংকলন। তৃতীয়-সংস্করণ সঞ্চয়িতায় প্রকাশের পূর্বে কবির অন্য কোনো কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় নাই। পরে দ্বিতীয়সংস্করণ পত্রপুটের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার দুইটি ছন্দোবদ্ধ পাঠ বিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়-অংশে সংকলিত হইয়াছে।

—

সংযোজন

সঞ্চয়িতার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইবার পর রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া সঞ্চয়িতার প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণে, বহুপূর্বে-প্রকাশিত কিন্তু স্বল্পপ্রচারিত লেখন হইতে কোনো কবিতা সংকলিত হয় নাই। বর্তমানে এই-সকল কাব্যগ্রন্থ হইতে কবিতা সংকলন করিয়া গ্রন্থশেষে সংযোজন-রূপে দেওয়া হইল। কাব্যখ্যাতি নাই এরূপ কয়েক-খানি গ্রন্থ হইতেও কবিতা স্থান পাইয়াছে; মনে হয়, রসের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাদের উচ্চ কুলশীল অস্বীকৃত হইবে না।

এই নূতন সংকলন সবজনের মনোনীত হইবে, এরূপ মনে করা সম্ভব নহে। মূল সঞ্চয়িতা -পাঠে জানিবার সুযোগ ছিল কোন্ কোন্ কবিতা কবির প্রিয়, কবির নিজের 'চোখে' রসোজ্জ্বল, সুন্দর। ইহাই এক পরম লাভ। এ ক্ষেত্রে সে সুযোগ থাকিতে পারে না। কেবল এই গ্রন্থের, এবং ইহাকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রকাব্যপরিচয়ের, কথঞ্চিৎ সম্পূর্ণতাসাধন -মানসেই এই অংশের সন্নিবেশ ও সার্থকতা।

৭২৭-৬৮ গীতবিতান। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য এবং গীতালি কাব্য হইতে গীতিকবিতার সংকলন কবি স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন। তৎপরবর্তী সময়ে কবি এমন বহু শত গান লিখিয়াছেন যাহার প্রত্যেকটিই অতুলনীয় কবিত্বসম্পদে ও সুরসৌষ্ঠবে সৌন্দর্যসৃষ্টির চরম উৎকর্ষে উত্তীর্ণ। বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে ত্রিশ-চল্লিশটি রচনা চয়ন করিয়া তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, কেবল দিক্-নির্দেশ হইয়া থাকিলেই এই সঙ্কলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

প্রধানতঃ দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের পাঠ লওয়া হইয়াছে। ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে উহার মুদ্রণ সমাধা হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত প্রায় সমুদয় গান স্বয়ং শ্রেণীবিভাগ করিয়া দুই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেন এবং লেখেন যে, 'ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।'

বলা উচিত, কবিতার ছন্দে অনায়াসে পড়া যায়, এ স্থলে প্রধানতঃ এরূপ রচনাই চয়ন করা হইয়াছে। অল্প কয়েকটি রচনায় ব্যতিক্রম দেখা যাইবে। যেমন পঁয়ত্রিশ-সংখ্যক গানে 'দিন ফুরালো' এবং চল্লিশ-সংখ্যক গানে 'যাবে না' 'পাব না' প্রভৃতি শ্লোকাংশের উপক্রমে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে হয়তো ছন্দ ও ভাব উভয়েরই চারুতা পরিস্ফুট হইবে। পনেরো-সংখ্যক গানে অন্ত্যস্থিত অনুপ্রাস বা চরণে চরণে মিল অল্পই আছে। উত্তরকালীন বহু রচনাতেই কবি গানকে কবিতার নিপুণ ছন্দোবন্ধন হইতে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়াছেন। অখণ্ড গীতবিতানে বা পাণ্ডুলিপিতে এমন বহু গান খুঁজিয়া পাওয়া যায় যাহার গঠন গদ্যকবিতার অনুরূপ।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, গীতিকবিতার ধুয়া বারবার পঠিত বা গীত হইয়া থাকে। অথচ, সব সময়ে উহা বারবার মুদ্রিত হয় নাই। এ বিষয়ে মূল পুস্তকের অনুসরণ করা হইয়াছে।

১২৭ ভারতবিধাতা। গীতালির পূর্ববর্তী এই রচনাটি ১৩১৮ মাঘের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ঐ বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়। তৎপূর্বে ১৩১৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনেও গাওয়া হইয়াছিল।

ছন্দপরিচয়। এই রচনাটি বহুলাংশে সংস্কৃত ছন্দোনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তদনুসারে অকারান্ত শব্দকে অকারান্তরূপে উচ্চারণ করা এবং আ ঈ ঊ এ ও এই পাঁচটি স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ করা আবশ্যক। কেবল পঞ্চম স্তবকের 'গাহে' শব্দের একারের উচ্চারণ হ্রস্ব। সংস্কৃত ছন্দে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তস্থিত হ্রস্ব স্বরও দীর্ঘ বলে স্বীকৃত হয়। তদনুসারে প্রথম স্তবকের 'বঙ্গ' ও 'তরঙ্গ' শব্দে অকারের এবং তৃতীয় স্তবকে 'রাত্রি শব্দে ইকারের উচ্চারণ দীর্ঘ হবে। তা ছাড়া, যুক্তধ্বনিমাত্রই, যেমন— সিন্ধু উৎকল ও জৈন শব্দের সন্ উৎ ও জৈ (জই) ধ্বনি দীর্ঘ বলে স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শঙ্খধ্বনি, দুঃখত্রাতা ও দুঃখত্রায়ক শব্দের উচ্চারণরূপ হচ্ছে যথাক্রমে শঙ্খদ্‌ধ্বনি, দুক্‌খত্‌ত্রাতা ও

দ্বিকৃৎসংত্রাত্মক। এইভাবে হ্রস্বধ্বনিকে এক মাত্রা ও দীর্ঘধ্বনিকে দুই মাত্রা ধরে হিসাব করলে অধিকাংশ পঙ্‌ক্তিতে ২৮ মাত্রা পাওয়া যাবে; আর প্রত্যেক স্তবকে একটি করে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি আছে, তার মাত্রাসংখ্যা ৩৬। কেবল প্রথম স্তবকের 'পঞ্জাব' শব্দের পঞ্ (পন্) ধ্বনিটা পঙ্‌ক্তিবহির্ভূত অতিপর্ব বলে স্বীকার্য, অর্থাৎ মাত্রাগণনার সময় এই ধ্বনিটাকে হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে। ছোটো পঙ্‌ক্তিগুলিতে ষোলো মাত্রার পরে এবং বড়ো পঙ্‌ক্তিগুলিতে বারো ও চব্বিশ মাত্রার পরে একটি করে অপেক্ষাকৃত প্রবল যতি আছে; প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতি।[১]

৭৩৮।৩৯।৪৪ একুশ, বাইশ ও তেত্রিশ -সংখ্যক গানের এক-একটি পাঠান্তর যথাক্রমে পাণ্ডুলিপি প্রবাসী-পত্রিকা ও বনবাণী হইতে উদ্ধৃত হইল। দ্বিতীয় গানটি পাণ্ডুলিপিতেও পাওয়া গিয়াছে এবং অধুনা তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানে সংকলিত হইয়াছে; ইহাতে সুর দেওয়া হইয়াছিল।

আশ্বিনে বেণু বাজিল ও পারে বনের ছায়ে—
তাহারি স্বপন লাগিল গায়ে।
সে সুর সাগর হয়ে এল পার,
যেন আনে বাণী দূর বারতার
চিরপরিচিত কোন্ সে জনার— বিদেশী বায়ে
বনের ছায়ে
তাহারি স্বপন লাগিল গায়ে।

এ পারে রয়েছি ঘন জনতায় মগন কাজে—
শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী কেন গো বাজে!
রচি তোলে ছবি আলোতে ও গীতে—

১ এই ছন্দপরিচয়টি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সৌজন্যে।

যেন চিরচেনা বনপথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে—
বনের ছায়ে
তাহারি পরশ লাগিল গায়ে॥

মারুর জাহাজ
২ অক্টোবর ১৯২৭

২

এবার বুঝি ভোলার বেলা হল—
ক্ষতি কী তাহে যদি বা তুমি ভোল!
যাবার রাতি ভরিল গানে, সেই কথাটি রহিল প্রাণে—
ক্ষণেক তরে আমার পানে করুণ আঁখি তোলো।
সন্ধ্যাতারা এমনি ভরা সাঁঝে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশ-মাঝে।
এই-যে সুর বাজে বীণাতে যেথানে যাব রহিবে সাথে—
আজিকে তবে আপন হাতে বিদায়দ্বার খোলো।

শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

৩

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি?
ছিল তো শেফালিকা তোমারি-লিপি-লিখা,
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি।
কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি।
তোমার যে আলোকে অমৃত দিত চোখে
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি?॥

[অগ্রহায়ণ ১৩৩৪]

৭৪৮-৫৫ লেখন। ভূমিকা (৭. ১১. ১৯২৬) হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবিতাগুলির 'শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে, রুমালে

কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তার পরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমন করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের।' লেখন গ্রন্থ কবির হস্তলিপির প্রতিলিপি-রূপেই ছাপা হয়, তবে উহাই যে তাহার প্রধান বা একমাত্র মূল্য নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। ১৯২৬ সালের একখানি ডায়ারিতে, সংকলিত অধিকাংশ কবিতাই কবির হাতের লেখায় পাওয়া যায়. তারিখ-দেওয়া অন্য কবিতা দৃষ্টে মনে হয়, এগুলি ১৩৩৩ সালেই রচিত হওয়া বিচিত্র নয়।

৭৫৬-৫৭ স্ফুলিঙ্গ। ৩০-৩৭-সংখ্যক কবিতা কবির নূতন কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত। লেখনের কবিতাগুলির সগোত্র। এগুলির মধ্যে ৩১-সংখ্যক কবিতার ইংরেজি মাত্র লেখনে আছে, ৩৪-সংখ্যক কবিতার স্বাক্ষরে '৭ পৌষ ১৩৩৬' এই তারিখ পাওয়া যায়; ৩৬-সংখ্যক কবিতা ছন্দ গ্রন্থে বক্তব্যের দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত ও তৎপূর্বে ১৩২৪ চৈত্রের সবুজ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, সর্বশেষ কবিতাটি 'একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ'।

লেখন বা স্ফুলিঙ্গ কাব্যের কবিতাবলীর সবিশেষ রচনাকাল না জানায়, তদনুযায়ী সাজাইবার চেষ্টা করা হয় নাই।

৭৫৮।৭৫৯ নদীর ঘাটের কাছে। একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু। কবিতা দুটি যথাক্রমে সহজ পাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ হইতে সংকলিত। 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থে দ্বিতীয় কবিতাটির এরূপ একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—

ইঁটের টোপর-মাথায়-পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে, ইঁটের আসন পাতা।
ফাল্গুনে বয় বসন্তবায়, না দেয় তারে নাড়া—
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে একটু না দেয় কাঁপন;
শীত-বসন্তে সমানভাবে করে ঋতু-যাপন।

অনেক দিনের কথা হল, স্বপ্নে দেখেছিনু,
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে বললে আমায় বিনু
'চেয়ে দেখো'— ছুটে দেখি চৌকিখানা ছেড়ে,
কলকাতাটা চলে বেড়ায় ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হয়ে চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি অজগরের দল,
ট্রামগাড়ি তার পিঠে চেপে করছে টলমল্।
দোকান বাজার ওঠে নামে যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গির মাঠখানা ওই যাচ্ছে সরি সরি।
মনুমেণ্টে লেগেছে দোল, উল্‌টিয়ে বা ফেলে—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে।
ইস্কুলেতে ছেলেরা সব করতেছে হৈ-হৈ—
অঙ্কের বই নৃত্য করে ব্যাকরণের বই।
মেজের 'পরে গড়িয়ে বেড়ায় ইংরেজি বইখানা,
ম্যাপ্‌গুলো সব পাখির মতো ঝাপট মারে ডানা।
ঘণ্টাখানা দুলে দুলে ঢঙ-ঢঙা-ঢঙ বাজে—
দিন চলে যায়, কিছুতে সে থামতে পারে না যে।
রান্নাঘরে কেঁদে বলে রান্নাঘরের ঝি,
'লাউ কুমড়ো দৌড়ে বেড়ায় আমি করব কী।'
হাজার হাজার মানুষ চেঁচায় 'আরে থামো থামো!
কোথা থেকে কোথায় যাবে, কেমন এ পাগ্‌লামো!'
'আরে আরে চলল কোথায়' হাবড়ার ব্রিজ বলে,—
'একটুকু আর নড়লে আমি পড়ব খ'সে জলে।'
বড়োবাজার মেছোবাজার চীনেবাজার থেকে
'স্থির হয়ে রও' 'স্থির হয়ে রও' বলে সবাই হেঁকে।
আমি ভাবছি, যাক-না-কেন, ভাবনা কিছুই নাই—
কলকাতা নয় দিল্লি যাবে কিম্বা সে বোম্বাই।

হঠাৎ কিসের আওয়াজ হল, তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাকিয়ে দেখি কলকাতা সেই আছে কলকাতায়॥

৬ পৌষ ১৩৩৬

৭৬০ রঙ্গ। জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ 'ছড়াটির অনুকরণে লিখিত।' লোকসাহিত্য গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৭৬১-৬২ খাপছাড়া। কবির স্বরচিত চিত্রে শোভিত। প্রকাশ ১৩৪৩ মাঘ।

৭৭৩-৭৭ প্রান্তিক। সংকলিত প্রথম দুটি কবিতা বাদে, অন্যগুলি ১৯৩৭ সালের গুরুতর পীড়ার পর আরোগ্যলাভের মুখে রচিত।

৭৭৩ অবরুদ্ধ ছিল বায়ু। শেষ সপ্তক কাব্যের তেইশ-সংখ্যক কবিতায় এই ভাবই (সংকলিত কবিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক তুলনীয়) গদ্যছন্দে রূপলাভ করিয়াছে—

আজ শরতের আলোয় এই-যে চেয়ে দেখি,
মনে হয়, এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে॥

কল্পনা করছি—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলই তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্য যুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।

তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল।
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো॥

আমার নয় চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর,
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে,
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজও শব্দ ভাষা পায় নি,
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন—
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল পাখি জাগল যেন।

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

৭৭৭ পরমমূল্য। একটি পূর্বপাঠ জয়শ্রী পত্রিকার ১৩৪১ বৈশাখ সংখ্যা হইতে উদ্‌ধৃত হইল—

> জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি তোমারে পরম মূল্য
> রূপসত্তায় এলে যবে সাজি সূর্যতারার তুল্য।
> দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
> নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
> দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
> সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবসরাত্রি।
> সম্মুখে গেছে অসীমের পানে জীবযাত্রার পন্থ,
> সেথা চল তুমি— বলো, কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত।

২২ মাঘ ১৩৩৪

৮০১ যক্ষ। মেঘদূত (পৃ ৯৯) কবিতার সহিত তুলনীয়।

৮০২ উদ্‌বৃত্ত। এই গীতিকবিতাটি পৃথক যে রূপে গীত হইয়া থাকে, গীত-বিতান হইতে তাহা সংকলিত হইল—

> যদি হায়, জীবনপূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
> মন তবু জানে জানে—
> চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
> ভাবনার প্রাঙ্গণে।
> বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি
> তবু সংকুচিত তীরে তীরে
> ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়—
> পিয়াসী লয় তাহা ভাগ্য মানি।
> মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
> যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।
> দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
> যত্নে ধরে রাখি,
> সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন।

৮১৬-২৯ জন্মদিনে। রোগশয্যায়। আরোগ্য। রচনার কালক্রম রক্ষা করিয়া জন্মদিনে কাব্যের একটি কবিতা এই গুচ্ছের প্রথমে এবং অন্য দুইটি আরোগ্য কাব্যের পূর্বে সন্নিবিষ্ট হইল। জন্মদিনের কতকগুলি কবিতা বাদে এই তিনখানি কাব্যই কবির অসুস্থ বা শয্যাশায়ী অবস্থায় রচনা। রোগশয্যায় গ্রন্থের সূচনায় কবি তাই অহেতুক সংকোচে বলিয়াছেন—

> সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
> যদি ক্ষণকালতরে
> ক্লান্ত উর্বশীর
> তালভঙ্গ হয়,
> দেবরাজ করে না মার্জনা।
> মানবের সভাঙ্গনে
> সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
> তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
> তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে—
> কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপতালে।

৮১৮ বরণ। এই কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি; রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারই একটুখানি নমুনা পাঠাই। মংপু। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

২৭ সেপ্টেম্বরে কবি সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন।

৮১৯ রূপের মালা। 'রোগমুক্তির পর লিখিত সর্বপ্রথম কবিতা'।

৮২৫ ঘণ্টা বাজে দূরে। ইহার অনেক অংশ গঙ্গাতীরে ও গাজিপুরের গঙ্গাতীরে বাসের স্মৃতিচিত্র বলিয়া মনে হয়। ইহার তৃতীয় স্তবক

ছিন্নপত্রে ৩৬-সংখ্যক চিঠির সহিত তুলনীয়—

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বহুকাল হল ছেলেবেলায় বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম— একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে— গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। অক্টোবর ১৮৯১

৮৭৪ দুঃখের আঁধার রাত্রি। তোমার সৃষ্টির পথ। এই দুইটি রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা; তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে বলিয়া যান এবং অন্যের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। পুস্তকের বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে প্রথম কবিতাটি 'পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন,' কিন্তু দ্বিতীয়টি 'সংশোধন করিবার অবসর ও সুযোগ তাঁহার হয় নাই।'

মন্তব্য

বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে বহু স্থলে ছিন্নপত্র গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, কদাচিৎ ছিন্নপত্রাবলীরও উল্লেখ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের সব চিঠি প্রথমোক্ত গ্রন্থে না থাকিলেও, প্রথম-অষ্টম বাদে ছিন্নপত্রের সব চিঠিই— অনেক সময় বর্ধিত আকারে এবং সামান্য পাঠান্তরে— ছিন্নপত্রাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থে একই পত্রের সূচকসংখ্যা ভিন্ন হইলেও, তারিখ অভিন্ন।

সাম্প্রতিক পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনার ফলে কয়েকটি রচনার পূর্বমুদ্রিত ভ্রান্ত তারিখ সংশোধিত হইল। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' অংশে কতকগুলি কবিতার রচনাস্থান ছিন্নপত্রাবলীর সাহায্যে অনুমান করা সম্ভব হইয়াছে; এরূপ সমুদয় নূতন তথ্য [ ] বন্ধনী মধ্যে দেখানো হইল।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি, সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রথম প্রকাশকালে মুদ্রিত পাঠ, এ-সকল মিলাইয়া কোনো কোনো স্থলে যথার্থ পাঠ -নির্ধারণ সম্ভবপর হইয়াছে। যথা, ২১৪ পৃষ্ঠায় "সুখ" কবিতার দ্বিতীয় ছত্রে 'স্বচ্ছ' পাঠ পাণ্ডুলিপিতে, ১৩০০

আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা সাধনায়, চিত্রা গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে (১৩০২), 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (১৩০৩) ও 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) পাওয়া যায় ; 'সুন্দর' এই পাঠ পরবর্তীকালে দেখা দিয়াছে। "হিং টিং ছট্" কবিতায় ১১৫ পৃষ্ঠার একাদশ ছত্রে 'ঝট্পট্' পাঠ পাণ্ডুলিপিতে, ১২৯৯ শ্রাবণ-সংখ্যা সাধনায়, সোনার তরী গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে (১৩০০), 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (১৩০৩) ও 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) পাওয়া যায় ; 'ছট্‌কট্' পাঠ পরবর্তীকালের।

—

প্রথম ছত্রের সূচী